Vol. 8 | No. 1 | 1964

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উপন্যাসে কালাপাহাড়

Volume	8
Issue	1
Year	1964
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল কালাম মনজুর মোরসেদ
Published online	June 15, 1964
DOI	10.62328/sp.v8i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v8i1.8
Pages	198-273
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

উপন্যাসে কালাপাহাড়

আবুল কালাম মনজুর মোরসেদ

। পটভূমি ।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে কালাপাহাড় উপন্যাস সৃষ্টির একটি গভীর আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই শ্রেণীর উপন্যাসগুলি মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াপুষ্ট। সেকারণে দুই শতকের মূল ধারা পটভূমিকা হিসাবে আলোচিত না হলে এই জাতীয় রচনার মৌল উৎসই উপেক্ষিত থেকে যাবে। কালাপাহাড় ছাড়াও সীতারাম, প্রতাপাদিত্য, গণেশ-সম্পর্কিত উপন্যাস তৎকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল। কালাপাহাড়-কেন্দ্রিক — প্রথম ও শেষ গ্রন্থের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৮১ ও ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ। আলোচ্যকালে বাঙলা দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলে নাটক ও উপন্যাস শ্রেণীর রচনাকে সহজেই ঐসব আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত বলে চিহ্নিত করা যায়।

জাতীয় চেতনা বাঙলাদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের জিনিষ ; য়ুরোপীয় ভাবধারার সংস্পর্শে আসার পর গণমানসে এই চেতনা দানা বাঁধতে থাকে। তারই প্রত্যক্ষ ফলে বর্তমানকে জানার সঙ্গে অতীতকে জানার প্রবল চেতনাও জাগ্রত হয়। ঊনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেও তার রূপ সম্পর্কে একটি বহু বিতর্কমূলক প্রশ্ন জাগে। পাক-ভারত হিন্দু-মুসলমান উভয়ের আবাস-ভূমি হওয়ায় তার জাতীয়তাররূপ কী হবে — এই চিন্তা নেতাদের মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা পাক-ভারতকে 'হিন্দুস্থান' রূপে ঘোষণা করাই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয়। অপরদিকে মুসলমানরা এ-দেশের সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে নিজের জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি আন্দোলনের সামনে উপস্থিত করে।

প্রথম যুগের এই দ্বন্দ্ব সমাকীর্ণ রূপ থেকে জাতীয়তাবাদের খণ্ডিত অস্তিত্ব সহজেই অনুমেয়।

হিন্দু-জাতীয়তাবাধের প্রথম স্পন্দন অনুভূত হয় হিন্দু মেলা, বা চৈত্র মেলায়। প্রধানত ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগেই জাতীয় মেলার সূত্রপাত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। রাজ নারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ জনসমক্ষে তুলে ধরা। এই উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদ-সভার উদ্যোগে 'ন্যাশনাল পেপার নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল 'হিন্দুমেলা ও নবগোপাল মিত্র' প্রবন্ধে হিন্দুমেলার প্রকৃত আদর্শ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ

> 'যেমন নামে সেইরূপ ভাবে ও কাজেও ইহা হিন্দু মেলাই হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন। এই মেলাতে যে সকল বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, তাহা সকলই হিন্দু ভাবের দ্বারা প্রণোদিত ও হিন্দুর গুণ-গরিমায় পরিপুষ্ট ছিল।'[১]

নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাসনাল পেপারে' ইংরেজী সবই ভুল থাকত। এ-ও ছিল তাঁর স্বাদেশিকতার একটা লক্ষণ। সে যুগের বাঙালীর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম স্বাদেশিকতার আদর্শ হাতে কলমে গড়ে তোলার জন্য প্রয়াস পেয়েছিলেন।[২]

বাঙলার হিন্দু মেলার মত মহারাষ্ট্রেও বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সূচনা হয়। 'গণপতি পূজা' সর্বজনীন রূপে প্রবর্তিত হয় তাঁরই নেতৃত্বে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূজোর সাহায্যে সর্বশ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয়দের একই আন্দোলনের অন্তর্গত করা। এই উপলক্ষে ক্রমান্বয়ে দশদিন উৎসব চলে এবং উৎসবে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্যে মহারাষ্ট্রীয়দের অতীত বীর্য-কাহিনী, শিবাজীর কীর্তিকলাপ সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হতে থাকে।

হিন্দু জাতীয়তার বিকৃতরূপ প্রথম স্পষ্ট হয় পুণায় (১৮৯৩ খ্রীঃ)। এখানে গো-বধ নিবারণী সভা স্থাপিত হলে জাতীয়তাবাদের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠে। গো-বধকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং কয়েকস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে একদা বিপ্লবী লালা হরদয়াল উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রচার করেন। তিনি 'হিন্দু সংগঠন' ও মুসলমানদের 'শুদ্ধি' আন্দোলন প্রচার করতে থাকেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন গোস্বামী — ও আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই আন্দোলনে বিশেষ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত পাক-ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার করলে তাকে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায় না। সে-যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গোড়াতেই যে ত্রুটি নিহিত ছিল তা সমকালীন সাহিত্য, রাজনৈতিক ভাবনার প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। স্বাদেশিক ভাব প্রচারের ক্ষেত্রে ইংরেজরা বিরুদ্ধপক্ষ হলেও সাহিত্যে তাদের দাঁড় করানো হত না। তার পরিবর্তে মুসলমানদের যবনরূপে চিত্রিত করে তাদের ওপর আক্রোশ বর্ষিত হত। বঙ্কিম প্রথম এই পথ দেখান। তার ফলে,

> 'বঙ্কিমের এই এক্সপেরিমেণ্ট সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে ইন্ধন যোগাল। মুসলমানের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের পথে বাধার সৃষ্টি করল। স্বাদেশিকতার আদর্শটিকে খণ্ডিত করে দিল।'[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে এক বাঙালী হিন্দু ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলমানদের পক্ষে 'দেশকে দেবীরূপে কল্পনা করা ছিল একেবারে অসম্ভব। অপর পক্ষে রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে 'সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং' গান করা একান্ত অর্থহীন। এ-সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য ঃ

> 'দশপ্রহরণধারিণী 'দুর্গার' আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া তাহাকে মানিয়া লইতে হইলে মনের অনেকখানি কসরৎ করিতে হয়। মুসলমানেরা সেরূপ প্রতীকাদির

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় অভ্যস্ত নহে। অথচ সেই সংগীতকে জাতীয় সংগীতের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়াতে সমস্যার সমাধান হয় নাই।'[৪]

রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাতেও হিন্দু-জাতীয়তা-ভাব বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় মনীষীরা প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। লালা মুন্সিরায় হরিদ্বারের কাছে প্রাচীন শিক্ষাশ্রমের অনুসরণে গুরুকুল আশ্রম স্থাপন করেন; রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ঔপনিষদিক আশ্রমের অনুরূপ। স্বামী বিবেকনন্দও সন্ন্যাস আশ্রম শিক্ষার জন্যে বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। এ-সবের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের আত্মার অনুসন্ধান।

'তিন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তিন মনীষীই অতীত ভারতের দিকে মুখ ফিরাইয়া 'হিন্দু কি' তাহা আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন।'[৫]

বলাবাহুল্য উপরোক্ত শিক্ষা-আশ্রমের সঙ্গে মুসলমান মানসের কোন সম্পর্ক ছিল না বলে তারা শিক্ষা-আদর্শ গ্রহণ করতে পারেনি এবং সেই সঙ্গে মুসলমানের শিক্ষা আদর্শের রূপ সম্পর্কে তাদের মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। এই আন্দোলনের পূর্বে সৈয়দ আহমদ মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আলিগড় কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই মুসলমানদের কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদানের বিরোধিতা করেছিলেন—হিন্দু শিক্ষা-আদর্শের প্রবর্তন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে স্যার সৈয়দের মতামত অবশেষে সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হয়। বঙ্গ-ভঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিশ্র চেতনা দেখা দেয়। সমন্বয়পন্থীরা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেননি — তাঁদের বিরুদ্ধ দল, এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন।

'দেশ বিভক্ত হইয়াছে তজ্জন্য মন যেমন ভাবালুতায় ব্যথিত, জাতীয় জীবনে নবীন শক্তির আবির্ভাবে মন তেমনই পুলকিত। বঙ্গচ্ছেদের দিনকে রাখী-বন্দনের দ্বারা উদযাপিত করা হইল, সেদিন অরন্ধন — লোকে রবীন্দ্রনাথের সদ্য রচিত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গাহিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া রাখীবন্ধন করিল, ইহার সঙ্গে থাকিল 'গঙ্গাস্নান' অর্থাৎ হিন্দুদের পক্ষে ইহা জাতীয়তা ভাবেরই একটি অঙ্গ।'[১]

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে অরবিন্দ বলেছিলেন, 'বঙ্গভঙ্গ greatest blessing ইহা মরীচিকা বা illusion — দূর করিয়াছে।'[৭]

বঙ্গভঙ্গ করার জন্য হিন্দুরা যে বর্জন আন্দোলন শুরু করেছিল পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা তার সমর্থন করেনি। তারা এই বয়কট আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে পরিহার করেছিল, এবং এ ব্যাপারে ঢাকার নওয়াব ও মৌলভী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বই ছিল তাদের আদর্শ।

এই সময়ে হিন্দু-ধর্ম প্রচারের মানসিকতা অতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পায়। 'সন্ধ্যা' পত্রিকা অবলম্বন করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই আসরে উগ্র ধর্মান্ধতা নিয়ে নামেন। তিনি বলেন,

> 'আমরা হিন্দু, আমরা হিন্দু থাকিব, বেশ-ভূষায় অশনে-বসনে, সর্বপ্রকারে হিন্দু থাকিব।— ইউরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ব্রাহ্মণের শিশু হইয়া জাতি মর্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না।— সমুদয়ের ভিতরেও এক সুরের খেলা থাকিবে বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম।'[৮]

ব্রহ্মবান্ধব সর্বপ্রথম যে 'গোঁড়া হিন্দুয়ানী' ও 'কড়া পাকের রাজনীতি' পরিবেশন করলেন তা ক্রমশ একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে তিলকের নেতৃত্বে ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্তিত হয়। বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সময় তার প্রবাহ বাংলা দেশেও এসে পৌঁছায়। সখারাম গণেশ দেউস্কর বাংলায় শিবাজী-উৎসব প্রবর্তন করেন। দেউস্কর রচিত 'শিবাজীর দীক্ষা' পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাস্বরূপ[৯] তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় হিন্দু-ভারতের স্বপ্নাদর্শের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙালী মানসের এই পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। কেননা, যে মারাঠা অত্যাচারে একদা বাঙলা বিপর্যস্ত হয়েছিল, তার ধন-সম্পত্তি ও নিরাপত্তা হয়েছিল অন্তর্হিত, নর-নারী নির্বিশেষে তাদের অত্যাচারের বলি হয়েছিল — সেই বর্গীর হাঙ্গামার প্রধান হোতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাহেন্দ্রক্ষণে জাতীয়-বীর হিসাবে পূজিত হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় লিখলেন ঃ

'মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী,
এক কণ্ঠে বলো জয়তু শিবাজী।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালী,
এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব
দক্ষিণ ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

এই ঘটনার দু' বছর পর শিবাজী-উৎসবের অঙ্গস্বরূপ ভবানী পূজার প্রবর্তন করা হয়। চরমপন্থী নেতারা হিন্দুদের ধর্মভাব উত্তেজিত করতে থাকেন। মুসলমানরা এই আন্দোলনে যোগদান করতে পারে কি না নেতৃবৃন্দ সে-কথা মোটেই চিন্তা করেননি। 'বন্দেমাতরম' বা 'শিবাজী উৎসব' কোনটিই মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের মূলবস্তু ছিল মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করে হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। 'বন্দেমাতরম' তারই সামগান। আর 'শিবাজী উৎসবের' লক্ষ্য ছিল মোগল শক্তি পর্যুদস্ত করে সেখানে হিন্দু-রাজ্যের পত্তন। আদর্শের দিক থেকে দুইই ছিল মুসলমান আদর্শের বিপরীত। সেজন্যে এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে মুসলমানরা যোগদান করতে পারেনি নীতিগতভাবেই। 'দেশাত্মবোধের মধ্যে হিন্দুত্বের পরিমাণ ছিল বেশী'।[১০]

এই প্রসঙ্গে মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান ধারাগুলির পর্যালোচনা প্রয়োজন। কেননা, জাতীয় আন্দোলনে হিন্দুত্বের গন্ধ বেশী থাকায় মুসলমানরা প্রথম থেকেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের কথা চিন্তা করেছিল। তা থেকেই মুসলিম জাতীয়-আন্দোলনের সূত্রপাত। মুসলিম জাতীয়তাবাদ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদের অবদান অত্যন্ত বেশি। একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে তাঁর প্রচারিত মতবাদই শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের মূলমন্ত্র হয়েছিল এবং তাঁর মতবাদকে কেন্দ্র করেই মুসলিম জাতীয়তাবাদ-আন্দোলন ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। সে অর্থে তিনি প্রথম সমাজ

সংস্কারক। লর্ড রিপণের সময় তাঁরই প্রচেষ্টায় মুসলমানদের জন্য আইন-পরিষদে পৃথক মনোনয়ন সম্ভব হয়। ১৮৮৭ সালে তিনি বলেছিলেন, —

> 'Now suppose that all the English ... . were to leave India. Then who would be rulers of India ? Is it possible that under these circumstances two nations—the Mohammedan and the Hindu — could sit on the same throne, and remain equal in power ? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable.'[১১]

সৈয়দ আহমদের উক্তি থেকে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে, হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক জাতি — ধর্ম ও জাতিগত বৈষম্যের জন্যে একই রাজ্যে উভয়ে অধীশ্বর হতে পারে না।

১৯০৬ সালে মুসলিগ লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে পাক-ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন নতুন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সর্বভারতীয়তা ও হিন্দু-সর্বস্বতা জাতীয়তাবাদ-আন্দোলনকে একটি স্পষ্ট মুসলিম বিরোধী চারিত্র দান করেছিল ; মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলমান তাই স্বীয় জাতীয় স্বার্থে উপরোক্ত পথ ছেড়ে একটি স্বতন্ত্র পথে চলতে শুরু করে। মুসলিম লীগের শাখা বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে স্থাপিত হয়। মুসলিম উলেমাদের ধর্ম প্রচারের ফলে ধর্ম বিষয়ে শিথিলতা দূরীভূত হতে থাকে এবং মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে ধর্মবিষয়ে উগ্র হয়ে ওঠে। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে লীগ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের শিক্ষা দীক্ষা চাকরী প্রভৃতি বিষয়ে নতুন প্রস্তাব করতে থাকে।

> 'মুসলিম লীগের আদর্শ হইল, কেবলমাত্র মুসলিম সমাজের স্বার্থরক্ষা। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করা এবং সংযত ভাষায় সরকার বাহাদুরের নিকট স্বজাতির অভাব অভিযোগ নিবেদন করা ; অর্থাৎ আগে তাহারা মুসলমান, পরে তাহারা ভারতবাসী — এই মতবাদই রূপ লইতেছে।'[১২]

পাক-ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথমার্ধে মুসলমানদের দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য ওহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে প্যান-ইসলামিক আন্দোলনের ফলে এ-দেশীয় মুসলমানদের বিশ্ব মুসলিম প্রীতি দেখা দিতে থাকে। এই সব আন্দোলনের ফলে মুসলমানরাও ধর্মবিষয়ে গোঁড়া হয়ে উঠে। মুসলমানরা যখন ধর্মীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় বিধান পালন করতে উদ্যত হয় তখন তারা হিন্দুদের চোখে অতিরিক্ত সাম্প্রদায়িক বলে বিবেচিত হয়। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে মহারাষ্ট্রীয়রা ধর্মের নামে গো-রক্ষা অন্দোলন শুরু করে। পরে এই মতবাদ বাঙলায় প্রসারিত হয়। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে গরু কোরবানি নিয়ে বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভীষণাকার ধারণ করে।

খিলাফত আন্দোলনের প্রচারের ফলে মুসলমানদের ধর্মোন্মত্ততা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের একদল মুসলমান ইংরেজ শাসিত পাক-ভারতেকে 'দারুল-হরব' বলে ঘোষণা করে আফগানিস্তানে হিজরত করে। অবশ্য, কিছুদিন পর তারা আবার পাক-ভারতে ফিরে এসেছিল। আসলে,

> 'হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই ধর্মের বড়াই হইল ধার্মিকতার ও জাতীয়তার লক্ষণ বা দুর্লক্ষণ [১৩]

গান্ধীর প্রচেষ্টায় সাময়িক কালের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে আলি-ভ্রাতৃদ্বয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই' এই মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে। অবশ্য এই সম্প্রীতি বেশীদিন বজায় থাকেনি। খিলাফত ও কংগ্রেসের যৌথ-মিলনের অবসানকালে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটে। এ-যুগে প্রচারিত উগ্র হিন্দু মতবাদ মুসলমানদের স্বতন্ত্র পথেই চালিত করতে থাকে। একটি উদাহরণ দিলেই এ-কথা স্পষ্ট হবে।

প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতা সবারকার শেষযুগে গোঁড়া হিন্দু মতের পরিপোষক হয়ে উঠেন। তিনি প্রচার করতে থাকেন, ভারত হিন্দুর দেশ বলে তারা অন্য সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব স্বীকার করবেনা। হিন্দুত্বের সংরক্ষণই হচ্ছে তাদের প্রকৃত কর্তব্য। এ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

'Although they (মুসলমান শাসক সম্প্রদায়) were territorially Indians they proved worst enemies if Hindudom and therefore, a Shivaji, a Govidsingh, a Pratap or the Peshwas had to fight against the Moslem domination and establish real Hindu Swarajya."

সবারকারের আদর্শ সম্পর্কে প্রভাতকুমারের গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যায়ঃ

'সবারকারের মতে ভারতের নাম হিন্দুস্থান, ভারতের ভাষা সংস্কৃত, তাহার লিপি দেবনাগরী, রাষ্ট্রভাষা হিন্দী এবং সেই হিন্দী ভাষা হইবে সংস্কৃতনিষ্ঠ, উহা উর্দু বা হিন্দুস্থানী নহে। দেশের সংবিধান সম্বন্ধে তাঁর মত এই যে, মুসলমান বলিয়াই কোনো সুবিধা সুযোগের অধিকারী তাহারা হইবে না।...

মহারাষ্ট্রের বীরপূজা প্রবর্তিত হওয়ার পর বাঙালীরাও নিজেদের জাতীয় ইতিহাস থেকে বাঙালী বীরের অনুসন্ধান করতে থাকে। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম গণেশ প্রভৃতি বাঙালী জমিদার, যাঁরা মুঘল সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তাঁরাই আলোচ্য কালে জাতীয় বীর আখ্যায় ভূষিত ও গৃহীত হন। তাঁদের কীর্তি অবলম্বনে নাটক, উপন্যাস, গাথাকাব্য রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়।[১৫] প্রতাপাদিত্য বা সীতারামের অপকর্ম অত্যাচারকে অস্বীকার করে কেবল মাত্র জাতীয় চেতনা উচ্ছেদ করার জন্য তাঁদের মহীয়ান নায়করূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। কলকাতায় মুসলমানরা একবার সিন্ধু বিজয়ী বীর মুহম্মদ-বিন-কাসিমের উৎসব করেছিল বলে জানা যায়।[১৬] বীরপূজার মধ্যে দিয়ে হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষ অতিশয় স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। হিন্দুরা মুসলমান-বিপক্ষীয় বীরদের পূজা করে এবং মুসলমানরাও বিকল্প প্রজা হিসাবে হিন্দু- বিজয়ী বিন-কাসিমের উৎসবের মাধ্যমে একই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দেয়।

পাক-ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর বিরুদ্ধ পথে অগ্রসর হয়েছিল উভয়ের 'ধর্ম' ও 'জাতি'র বিভিন্নতার জন্যে। কেউই ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। উভয়ে যে-ক্ষেত্রে একত্রিত হয়েছিল সেখানেও ভেদ-নীতি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। পানাহার প্রভৃতি সময় হিন্দু-নেতারা মুসলমানদের দূরে রাখতেন। একই বারান্দায় পানি পান করতেন

না। এ-থেকে বোঝা যায়, হিন্দুরা মুসলমানদের দলে টেনেছিল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ; সেখানে আন্তরিকতার পরিবর্তে কৃত্রিম সম্পর্কের মাত্রাই ছিল বেশী। শুধু মুসলমান নয়, বিভিন্ন হিন্দু সাম্প্রদায়ের মধ্যেও ভেদ-নীতি এত প্রকট হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল যে কোন কোন স্থানে বর্ণহিন্দু ও নমঃ শূদ্রদের মধ্যে দাঙ্গাও বেধে যায়। একই কারণে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব হয়নি।

ওপরে পাক-ভারতের জাতীয় আন্দোলনের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে কালাপাহাড় সম্পর্কিত উপন্যাস পাঠের প্রয়োজন। সমকালীন জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল কালাপাহাড় উপন্যাস। জাতীয়তাবাদের আন্দোলন সেকালে সমন্বয়পন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল কালাপাহাড়'শ্রেণীর উপন্যাসে তার স্বরূপ সংরক্ষিত হয়েছে।

। ঐতিহাসিক তথ্যাবলী ।

কালাপাহাড় ইতিহাসের পরিচিত চরিত্র। ষোড়শ শতকের বাঙলার ইতিহাসে কালাপাহাড়ের অত্যাচার পরবর্তীকালে বর্গীর হাঙ্গামার মত ত্রাস সৃষ্টিকারী চিত্র রূপে গণ মানসে স্থায়িত্ব লাভ করে। মুসলিম ঐতিহাসিকেরা ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে প্রথমে কালাপাহাড়ের উল্লেখ করেন। এই শ্রেণীর ইতিহাসের মধ্যে 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী', 'তারিখ-ই-শেরশাহী', 'তারিখ-ই-খাঁ জাহান লোদী', 'তারিখ-ই-দাউদী', 'আকবর নামা', 'রিয়াজউ-স-সলাতিন' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মুসলিম ঐতিহাসিকদের তথ্যাবলী গ্রহণ করে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকেরা রাজশাহী জেলার কিংবদন্তী অনুসারে কালাপাহাড় কাহিনী বিস্তৃতাকারে বর্ণনা করেছেন। তার ফলে ইতিহাস কিংবদন্তীর আশ্রয়ে অতি প্রাকৃত আকার ধারণ করে বহু পল্লবিত হয়ে পড়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকেরা কালাপাহাড়ের ঐতিহাসিক কার্যকারণের ওপর শুধুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবকাল, রাজনৈতিক কার্যাবলী, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত হয়েছে ঐতিহাসিক দায়িত্বের সঙ্গে। কিন্তু পরবর্তীকালের ইতিহাস লেখক ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে নিজেদের মনগড়া কাহিনীর সংযোগে

সম্পূর্ণ একটি নতুন কাহিনী নির্মাণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতির প্রথম প্রদর্শক। তিনি আয়েষা-কে নিয়ে যে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমাঞ্চ রচনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বহু পল্লবিত হয়। উনিশ শতকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব উপরোক্ত মনোভাবের একমাত্র কারণ। হিন্দু জাতীয়তার উদ্বোধনের সঙ্গে সাহিত্য, রাজনীতি, প্রভৃতিতে হিন্দু জাতিকে তুলে ধরার যে প্রয়াস দেখা যায় আয়েষা শ্রেণীর কাহিনীর জন্ম তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে। আয়েষার প্রেম কাহিনীর সাহায্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ঊর্ধ্বে তোলা হয়েছে। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল সর্বপ্রথম তাঁর বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে স্বকপোলকল্পিত কাহিনীর সমন্বয়ে বাঙালাদেশের সামাজিক ইতিহাস চিত্রিত করেন। পরবর্তীকালে নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁকেই অনুসরণ করে এই শ্রেণীর অনৈতিহাসিক উপাদানে গঠিত ইতিহাস লেখেন। দুর্গাচন্দ্র মুসলমান বাদশাহ কন্যার সঙ্গে হিন্দু রাজপুত্রের বহু প্রেম-কাহিনী গ্রন্থে বিবৃতি করলেও কাহিনীর সূত্রে কোন ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেননি। উপাখ্যান শ্রেণীর ইতিহাস থাকায় তাঁর গ্রন্থ পাঠক সমাজে অতিশয় জন প্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনেক উপন্যাসিক মূল কাহিনী নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস (?) রচনা করেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে দুর্গাচন্দ্র ও নগেন্দ্র নাথের গ্রন্থকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলে মূল্য দেওয়া যায় না এবং তাঁরা যে গল্প রচনা করেছেন সেগুলি ইতিহাস-বহির্ভূত কল্পিত 'কাহিনী'।

দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে মনগড়া কাহিনীর সংযোগে একটি নতুন কাহিনী নির্মাণ করেছেন। কাহিনীকারের রাষ্ট্রীয় আদর্শবাদিতা, জাত্যভিমান ইত্যাদি দিকগুলি এক্ষেত্রে অবিসংবাদিত ভাবে ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি অনৈতিহাসিক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। তার ফলে ইতিহাসোক্ত কালাপাহাড়ের কার্যকারণের পরিবর্তে তাঁর জাত্যভিমান, বংশমর্যাদা ইত্যাদি দিকগুলি অধিকতর বিপুলভাবে কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়ে বিভিন্ন জনের হাতে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিহাসের ঘটনার মধ্যে প্রধান হল কালা-পাহাড়ের সঙ্গে সোলেমান বা বরবকের সম্বন্ধ, সোলেমানের সেনাপতি রূপে উড়িষ্যা জয় ও মৃত্যু; অপর সমস্ত ঘটনাই কাল্পনিক অথবা কিংবদন্তী

আশ্রিত। কিংবদন্তীতে উল্লিখিত স্থানগুলির নাম ইতিহাসের সমর্থন পুষ্ট, তবে কাল্পনিক কাহিনী রচয়িতারা কাহিনীকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। কালাপাহাড় সম্পর্কিত সম্পূর্ণ কাহিনীটি নিম্নরূপ।

রাজশাহীর মন্দা[১৮] থানার অন্তর্গত বীরজাওন গ্রামের একটাকিয়া ভাদুড়ী বংশে কালাচাঁদ রায় জন্মগ্রহণ করেন।[১৯] তাঁর ডাক নাম ছিল 'রাজু'।[২০]

পিতা নয়ানচাঁদ রায় ছিলেন সেকালের একজন বিত্তশালী ভৌমিক। তৎকালীন গৌড় সুলতানের ফৌজদারী বিভাগে তিনি রাজকীয় কাজ করতেন। তাঁর উপাধি ছিল ভূঁইয়া। তাঁর মাতৃবংশ ছিলেন বৈষ্ণব। বাল্যকালে পিতার মৃত্যুর ফলে কালাপাহাড় মাতামহের কর্তৃত্বাধীনে পালিত হন। অল্প বয়সেই শ্রীপুরনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই মেয়ের সঙ্গে কালাচাঁদের বিবাহ হয়।[২১] বাল্যকাল থেকেই তিনি অস্ত্রবিদ্যা চর্চা শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে এ-বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হন। পরিণত বয়সে গৌড় সুলতান সুলেমান খাঁ কররানী তাঁর পূর্ব পরিচয় জেনে এবং প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে কালাচাঁদ রায়কে তাঁর পিতৃপদ প্রদান করেন।

গৌড়ে হিন্দু আমলাদের বসবাসের জন্য নির্মিত প্রাসাদ সন্নিকটস্থ ভবনে কালাচাঁদ বাস করতেন। তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। প্রতিদিন ব্রাহ্মণাচার পালন করতেন। মহানন্দায় প্রত্যুষে স্নান করা ছিল তাঁর প্রাত্যহিক বিধি। একদিন স্নান করে ফেরার সময় গবাক্ষপথে সুলতান-কন্যা তাঁকে দেখতে পান। তাঁর দেহসৌষ্ঠবে তিনি মুগ্ধ হন। তিনি আপন মনোভাব সখীদের কাছে ব্যক্ত করলে তারা বেগমের কাছে তাঁর মনোভাব খুলে বলে। সুলতান কন্যার মানস-আকাঙ্ক্ষা জানতে পেরে কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত কালাচাঁদের সঙ্গে তাঁর বিবাহে সম্মতি দেন। ইতিপূর্বেই বিভিন্ন গৌড়-সুলতান একটাকিয়া বংশের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন। সুলতান কালাচাঁদকে নিভৃত অন্দরমহলে ডেকে কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি বিবাহে বিশেষ অসম্মতি জানিয়ে তাঁকে নানা ভাবে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পূর্ব বিবাহের কথাও উল্লেখ করতে থাকেন। তাঁর অস্বীকৃতিতে সুলতান নিজেকে অপমানিত বোধ করে ক্রোধান্ধ হয়ে

কালাচাঁদের শিরচ্ছেদের আদেশ দেন। কথিত আছে, কালাচাঁদকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে দণ্ডাদেশ কার্যকরী করার সময় সুলতান কন্যা স্বয়ং অন্দরমহল থেকে বের হয়ে এসে প্রেমিকের প্রাণ রক্ষা করেন।

সুলতান-কন্যার অনুরাগ দর্শনে বিবাহে অস্বীকৃত কালাচাঁদ তাঁকে গ্রহণ করতে সম্মত হন। তাঁকে বিয়ে করার পরও তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করেন নি। বিবাহ-উত্তরকালে পূর্বকালীন সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্যে বহু অর্থ ব্যয় করেও সামাজিক নিগ্রহ থেকে অব্যাহতি পেলেন না। সমাজ-পতিদের বিচারে মুসলমান-কন্যা বিবাহের অভিযোগে তিনি সমাজচ্যুত হন। তখন তিনি শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাদেশের আশায় বৃথা মন্দিরদ্বারে সপ্তাহকাল অপেক্ষা করে রইলেন। দেবসেবকরা তাঁকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন জগন্নাথধাম থেকে। সমাজ-শাসনের আরক্ত চোখ তখন তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তোলে এবং ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

ধর্মান্তরের পর কালাপাহাড় সুদীর্ঘকাল অসংখ্য হিন্দু-মন্দির এবং মূর্তি ধ্বংস করে ত্রাসের সৃষ্টি করেন। বহু হিন্দুকে তিনি বলপ্রয়োগে নবধর্মে দীক্ষিত করেন। এই সময়েই তিনি ত্রাসসৃষ্টিকারী কালাপাহাড়[২২] (কালান্তক) হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

হিন্দু নিপীড়ক কালাপাহাড়ের অত্যাচারের নীরব সাক্ষী উড়িষ্যা, রায়, কামরূপ ও কুচবিহার[২৩] শ্রীক্ষেত্রের দেবসেবকদের হাতে তাঁর লাঞ্ছনা তিনি ভুলতে পারেননি। উড়িষ্যা অভিযানের সময় তিনি উৎকলরাজ মুকুন্দদেবকে পরাজিত ও নিহত করে মন্দির ধ্বংস করেন। জগন্নাথের মূর্তি তিনি মন্দির থেকে বের করে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় নদীতে ফেলে দেন। কথিত আছে, জগন্নাথক্ষেত্রে তাঁর আগমনের সংবাদে পাণ্ডারা ভীত হয়ে দেবমূর্তিকে অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে মন্দির থেকে অপসৃত করে নিকটবর্তী এক গর্তে পুঁতে রাখেন। কালাপাহাড় বহু অনুসন্ধানের পর প্রোথিত মূর্তি উদ্ধার করেন।[২৪] কালাপাহাড়ের নৃশংসতা সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন :

> 'উক্ত কালাপাহাড় এমন ভয়ানক যে তাঁহার জয় ঢক্কার ধ্বনিতে অনেক ক্রোশ দূরস্থিত দেবপ্রতিমাসকলের হস্ত পদাদি খসিয়া ভূমিতে পড়ে, এতদ্দেশীয় লোকেরা এমত কহিতেন।'[২৫]

কালাপাহাড়ের শেষ জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্ত এসেছে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তের অভাবে। জগন্নাথ মূর্তি অবমাননার পর তাঁর অনুতাপে সন্ন্যাসী হওয়া, গঙ্গায় ডুবে মৃত্যু, নিদ্রিত অবস্থায় কাশার পাণ্ডাদের হাতে নিহত হওয়া, বেলোল লোদির (যিনি তাঁর ক্ষমতা দর্শনে ভীত হয়ে উঠেছিলেন) ঘাতক কর্তৃক নিহত হওয়া ইত্যাদি মত এই প্রসঙ্গে প্রচলিত। ভক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায় — তিনি বিনাশরূপী রুদ্রের অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বিশ্বেশ্বরে লীন হয়ে গিয়েছিলেন।[২৬] আকবর নামার মতে মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ দাউদকে ধরার জন্যে কটকে উপস্থিত হলে কালাপাহাড়, বাবুইমঙ্গলী ও কয়েকজন আফগানী সেনানায়ক কাকসোল অধিকার করেন। কিন্তু 'অল্পদিন পরেই কালগঙ্গার তীরে মোগল বাহিনীর তোপে মৃত্যু বরণ করেন।[২৭] কালাপাহাড়ের পরিণতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে মুসলিম ঐতিহাসিকেরা পরিণতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণায় বিশ্বাসী। অপরপক্ষে সামাজিক ইতিহাসে রচয়িতারা পরিণতি সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ধারণায় বিশ্বাসী নন এবং তাঁদের মন্তব্য অনেকখানি ভাবালুতায় আপ্লুত। সেজন্যে কালাপাহাড়ের মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকদের মতই গ্রহণযোগ্য।

দুলনী-গর্ভে কালাপাহাড়ের 'ফতেমা'[২৮] নামে এক কন্যা জন্মে।

কালাপাহাড় সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে অনেক বিচ্ছিন্ন মন্তব্য পাওয়া যায়। 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা তার কিছু অংশ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। সেখান থেকে জানা যায়, একবার কালাপাহাড় দিল্লীর সুলতান সিকেন্দার লোদীর বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হয়ে তিনি দিল্লীতে আনীত হন। সিকেন্দার তাঁকে বিশেষ সম্মান দেখানোর ফলে তিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হন এবং শেষে তাঁরই সেনাপতি হয়ে বরবক শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

'তারিখ-ই-খাঁজাহান লোদী' থেকে জানা যায়, সিকেন্দার শাহ বরবক শাহকে ধরবার জন্যে ৪৯৯ হিজরীতে (১৪৯৩-৪ খ্রীঃ) কালাপাহাড়কে অযোধ্যা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

'তারিখ-ই-শেরশাহীর মতে কালাপাহাড় সুলতান বহলোল লোদীর কাছে, অযোধ্যা সরকার এবং আরও কয়েকখানি পরগণা জায়গীর পান। মৃত্যুকালে তিনি তিন শ' মণ সোনা ও অনেক অলঙ্কার রেখে যান।

ইতিহাস সচেতনতার অভাবে কালাপাহাড় সমস্যার সৃষ্টি। জনপ্রবাদের সূত্র ধরেই ইতিহাসে কালাপাহাড় একাধিক মূর্তি গ্রহণ করেছেন। ইতিহাসে দুজন কালাপাহাড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, একজন মুসলমান, অপরজন হিন্দু। প্রথমোক্ত কালাপাহাড়ের নাম মহম্মদ ফরমুলি। তিনি জৌনপুর অধিপতি বহলোল লোদীর ভাগিনেয় ও তাঁর পুত্র বরবক শাহের সেনাপতি ছিলেন। দিল্লীর সুলতান সিকেন্দার লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। কূটকৌশলী সেকেন্দার তাঁকে সম্মান দেখালে পরাজিত ফরমুলি বিস্মিত হন এবং তাঁরই সেনাপতিরূপে ১৪৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দে বরবক শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অপর মতে, কালাপাহাড় ছিলেন হিন্দু। পরে সোলেমান কররানীর কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে উড়িষ্যা জয় করেন। মন্দির ও দেবমন্দির ধ্বংসের পর তিনি কালাপাহাড়-রূপে পরিচিত হন। সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় একই কালাপাহাড় অসতর্কতাবশত ঐতিহাসিকদের কাছে দ্বৈত আকার পেয়েছেন। মূলত কালাপাহাড় ছিলেন একজন, তিনি সোলেমান কররানীর অন্যতম সেনাপতি। এই মতের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি রয়েছে।

কালাপাহাড় নামের মূলে একটি বিশেষ মানসিকতা বিদ্যমান। নতুবা মুসলমান সেনাপতি মন্দির ধ্বংস করলে এই নামে অভিহিত হতেন না। হিন্দু-সেনাপতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পর স্বধর্মের ওপর অত্যাচারের জন্যেই এই উপাধি লাভ করেছেন। এই নাম থেকে বোঝা যায় অন্য ধর্মের চেয়ে স্বধর্মের লোক বেশী অত্যাচারী হয় — কালাপাহাড় নামকরণ সেই বিতৃষ্ণ মনের পরিচয়।

বরবক শাহ ও সোলেমান কররানীর রাজত্বের মধ্যে সময়ের ব্যবধান টুকুও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। রুকন-উদ্দীন বরবক শাহ ১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ ও সোলেমান খান কররানী ১৫৬৪-৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। উভয়ের মধ্যে কালের ব্যবধান নব্বই বছর। কালাপাহাড়ের পক্ষে দুজনের সেনাপতিত্ব গ্রহণ কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। কালাপাহাড়ের সময় দিল্লীশ্বর ছিলেন

আকবর। তাঁর সময়ে উড়িষ্যা বিজয়ী সেনাপতির নাম পাওয়া যায় কালাপাহাড়। বহলোল লোদী বা বরবক শাহের সময়ে কালাপাহাড় নামে কোন সেনাপতি উড়িষ্যা জয় করেন নি — করেছিলেন ইসমাইল গাজী।[২৯] কালাপাহাড় এবং তিনি ভিন্ন। তা ছাড়া, ইসমাইল গাজী 'কালাপাহাড়' উপাধি পাননি বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়।[৩০]

কালাপাহাড়ের উড়িষ্যা জয়ের সময় সেখানকার রাজা ছিলেন হরিচন্দন মুকুন্দদেব। তিনি বহলোল লোদী ও বরবক শাহের সময় উড়িষ্যা জয় করেছিলেন আপাতত এ-সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও মুকন্দদেবের সঙ্গে উভয় সুলতানেরই রাজত্ব-কালের ব্যবধান অনেক — পঁচাশী বছরের মত।[৩১] কাজেই তাঁদের সময়ে কালা-পাহাড় কল্পনা অযৌক্তিক। বরবক শাহ ও সোলেমান কররানী উভয়েই উড়িষ্যা জয় করেছিলেন বলে ভ্রান্তভাবে কালাপাহাড়ের নাম দুজনের রাজত্বকালেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

অধিকাংশ ইতিহাসেই শেষোক্ত কালাপাহাড়ের নাম পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এরূপ অনুমান অবিধেয় নয় যে, একক কাহিনী থেকেই পরবর্তীকালে ইতিহাস অসচেতনতার ফলে মিশ্র কাহিনীর উদ্ভব হয়েছে। হিন্দু কালাচাঁদই মুসলমান হয়ে 'মহম্মদ ফরমুলি' নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর উপাধি হয়েছিল 'কালাপাহাড়।' কোন কোন সামাজিক ইতিহাস লেখক ভুলক্রমে 'কালাপাহাড়' উপাধি অবলম্বন করে কালাচাঁদকে প্রথম কালাপাহাড় এবং মহম্মদ ফরমুলিকে দ্বিতীয় কালাপাহাড় বলে অভিহিত করেছেন। রাজশাহীর কিংবদন্তী, কালাপাহাড়ের বংশ পরিচয় এ-কথারই স্বীকৃতি প্রদান করে।

কালাপাহাড় অবলম্বনে রচিত উপন্যাস চতুষ্টয়ে একই কাহিনীধারা অনুসৃত হয়নি। ঔপন্যাসিকেরা নিজ প্রয়োজনে কাহিনীর রূপান্তর ও পরিবর্তন করেছেন। উপন্যাসগুলির সার মর্ম সংক্ষেপে পর্যবেক্ষণ করলেই এই পার্থক্য অনুধাবন সহজ হবে।

প্রথম উপন্যাস :

কালাপাহাড় : শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশকাল : ১৮৯৯, পৃষ্ঠা ১৬৪।

মূল কাহিনী : মুখ্যত প্রভাত ও উষার প্রেম কাহিনী, দেশের জন্যে প্রভাতের কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সংক্ষেপে তাজ খাঁর কন্যা ও কালাপাহাড়ের প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় উপন্যাস :

কালাপাহাড় : যদুনাথ ভট্টাচার্য।

প্রকাশকাল : ১৯০৭, পৃঃ ৩৪১

মূল কাহিনী : নবাব সোলেমানের ভাই তাজ খাঁর কন্যা বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার পাটুলী গ্রামনিবাসী নিরঞ্জন রায়ের প্রতি মুগ্ধ হন এবং ঘটনার প্রভাবে নিরঞ্জন মুসলমান হয়ে কালাপাহাড় নামে সোলেমানের সেনাপতি হন।

তৃতীয় উপন্যাস :

কালাপাহাড় : রসিকচন্দ্র বসু।

প্রকাশকাল : ১৯১০, পৃঃ ৯১।

মূল কাহিনী : বাঙলার সুলতান সোলেমান কররানীর কন্যা দুলারীর সঙ্গে কালাচাঁদের বিবাহ এবং সোলেমানের সেনাপতি হিসাবে উড়িষ্যা জয় ও শেষ বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ।

চতুর্থ উপন্যাস :

রাণী ব্রজসুন্দরী : শচীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশকাল : ২৯১৮ পৃঃ ১৭৪ (বসুমতী সংস্করণ)।

মূল বিষয় : কালাপাহাড়ের পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী ও মুকুন্দদেবের বিস্তারিত কাহিনী। স্বল্প-স্থানে সোলেমান কররানীর কন্যার সঙ্গে কালাচাঁদের বিবাহ কাহিনী ও পরে উড়িষ্যা জয়।

গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সাধারণ পরিচিতি লক্ষ্য করলে এদের পারস্পরিক অসামঞ্জস্য বোঝা যায়। শ্রীশচন্দ্র ও যদুনাথের ঐতিহাসিক কাহিনীধারা ছিল একই — মূল কাহিনী নিয়ে উভয় লেখক নিজেদের মানসিক-ধারা অনুযায়ী কাহিনী রচনা করেছেন। রসিকচন্দ্রের কাহিনী প্রধানত প্রবাদ নির্ভরশীল এবং সেজন্যে উপন্যাসের বিস্তৃতির পরিবর্তে কাহিনী বর্ণনাই ছিল মূল লক্ষ্য। শচীশচন্দ্র প্রচলিত কাহিনীর চুম্বকমাত্র নিয়ে স্বতন্ত্র কাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসের

চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য উপন্যাসিকের কল্পনার মধ্যে অবলুপ্ত হয়েছে। কাহিনী-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লেখক-চতুষ্টয়ের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী, তাঁদের উপন্যাসের বিভিন্নতার কারণগুলি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

রসিকচন্দ্রের 'কালাপাহাড়' প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে। ইতিমধ্যে কালাপাহাড় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী দুর্গাচন্দ্র সান্যালের বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩১৩ সাল। রসিকচন্দ্রের আদর্শ ছিল দুর্গাচন্দ্রের গ্রন্থখানি। লেখক যে উপরোক্ত গ্রন্থদ্বারা কাহিনী রচনা করেছিলেন, তার প্রমাণ উপন্যাসে দু'ভাবে লভ্য, এক আদর্শ-বাদের দিক থেকে, দুই, কাহিনী গ্রন্থনের দিক দিয়ে। দুর্গাচন্দ্র কাহিনী বিস্তৃত আকারে নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন — রসিকচন্দ্র সেই কাহিনী সংবর্ধিত করেছেন মাত্র। দুর্গাচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে তাঁর কাহিনীর কোন মৌল বিরোধ নেই। লেখক ইতিহাসের স্থানকাল ও ঘটনার কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন করেননি — কাহিনী অথবা মতাদর্শের প্রয়োজনে। কালাপাহাড় সম্পর্কিত কাহিনী প্রবাদ অনুসারেই গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। ইতিহাস-বিষয়ক বিবৃতিও মূল তথ্যানুগত। 'অগ্নুৎপাত' অধ্যায়টি আলোচনা করলেই এ-কথা বোঝা যাবে। উপন্যাসে আছে কালাপাহাড় উড়িষ্যাধিপতিকে পরাজিত করে পুরীতে উপস্থিত হন। পাণ্ডা ও নগরবাসীরা মন্দির রক্ষার বৃথা চেষ্টা করেন। পাঠানসৈন্য মন্দিরের দরজা ভেঙে বিগ্রহ লুণ্ঠন করে ও শেষে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে।[৩২] ঔপন্যাসিক লিখেছেন, উড়িষ্যাধিপতি তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের উড়িয়া সৈনিকগণ পাঠানের কামান ও তরবারীর মুখে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারিল না;'[৩৩] — আলোচ্য মন্তব্য ইতিহাস সঙ্গত।[৩৪] উড়িষ্যা জয় করে কালাপাহাড় কামাখ্যা ধ্বংস করতে অগ্রসর হন। তখন কামাখ্যার রাজা ছিলেন নরনারায়ণ এবং সেনাপতি ছিলেন শিলা রায়। কালাপাহাড়ের বিজয়ী সেনা কামরূপ ধূলিসাৎ করে। দৈববশত শিলারায় কামরূপে উপস্থিত ছিলেন না, এবং 'পাঠানের তরবারীর ভয়ে আর্য-অনার্য বহু আসামবাসী ইসলামধর্ম গ্রহণ করিল।[৩৫] ইতিহাসে এই ঘটনার অন্যরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৬] মুসলমানদের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে নরনারায়ণ পরাজিত এবং শিলারায় বন্দী হন।

দ্বিতীয়বারে নরনারায়ণ আকবরের সহায়তায় যুদ্ধে জয়ী হন। এই সময় শিলারায় বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন।[৩৭]

কালাপাহাড়ের বারাণসী ধ্বংস প্রধান ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে অন্যতম। দিল্লী সম্রাট জৌনপুরের নবাবের সঙ্গে বহুদিন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পরও বারাণসী অধিকারে সক্ষম হন নি। দিল্লীর সম্রাট এবং সোলেমানের যৌথ উদ্যোগে কালাপাহাড়ের সেনাপতিত্বে জৌনপুর সহজেই অধিকৃত হল।[৩৮] জৌনপুর জয় করে কালাপাহাড় কাশী অধিকার করেন।

'কালাপাহাড়' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক পূর্ণভাবেই ইতিহাস ও কিংবদন্তী অনুসরণ করেছেন। মূলত তিনি কল্পনার অধিক আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। কালাপাহাড়ের সোলেমানের দরবারে কর্মগ্রহণ, নবাব-কন্যার সঙ্গে প্রেম ও পরিণয়, প্রধান সেনাপতি হিসাবে উড়িষ্যা জয় — প্রভৃতি প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে স্মরণীয়। 'কালাপাহাড়ের' সঙ্গে নবাব-কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে, বেগম ভাদুড়ী বংশের সঙ্গে পূর্বকালীন নবাব-কন্যাদের বিবাহের যে ইঙ্গিত করেন, তা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

> 'তারপর হিসাব করিয়া দেখিলে ভাদুড়ী বংশের সহিত সম্পর্ক এই নতুন হইতেছে না।[৩৯]

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসগুলি ভাদুড়ী বংশের সঙ্গে নবাব-বংশের বিবাহ-সম্পর্ক সমর্থন করে।

> 'অনেক নবাব ও বাদশাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।'[৪০]

এ-সম্পর্কে ঘটকদের গ্রন্থেও বহু উল্লেখ বিদ্যমান। 'বৃহৎবঙ্গে' ঘটক-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায়ঃ

> '২১জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান রাজকুমারী বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।[৪১]

কালাপাহাড়ের পরিণতি সম্পর্কে ইতিহাস ও সামাজিক গ্রন্থগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। রসিকচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে কালাপাহাড়ের অন্তিম-দৃশ্য সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ-বিজয় গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

> পাণ্ডারা প্রচার করিল, কালাপাহাড় ও বাদশাহ নন্দিনী, কালভৈরব ও অন্নপূর্ণার অংশ ছিলেন। কালাপাহাড় কালভৈরবের সহিত এবং সাজাদী, অন্নপূর্ণাতে মিশিয়া গিয়াছেন।[৪৩]

বিভিন্ন পরিণতি সম্পর্কে যে মতভেদ বিদ্যমান দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন।[৪৩]

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাণী ব্রজসুন্দরী' কালাপাহাড় উপন্যাস শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই মূল্যায়ন গ্রন্থের কাহিনী নির্মাণ, জীবন বোধ, চরিত্রে নিপুণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববর্তী গ্রন্থকার সাহিত্যকে ইতিহাসের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন, শচীশচন্দ্র বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ঐতিহাসিক উপাদান সাহিত্যের বৃহত্তর প্রয়োজনানুসারে উৎসর্গিত করাই ছিল ঔপন্যাসিকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

রাণী ব্রজসুন্দরীতে মূল ইতিহাস গৃহীত হলেও সাহিত্যিক প্রয়োজনে ঔপন্যাসিকের হাতে তা রূপান্তরলাভ করেছে। গল্পরস সৃজনের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী বয়ন করেছেন। ইতিহাসমূলক গ্রন্থে দেখা যায়, নবাবকন্যা রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে প্রথমে কালাচাঁদকে দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। উপন্যাসে তা নেই। সেখানে আছে, সুলতান তনয়ার উদ্যানে করিম শার আকস্মিক আবির্ভাবের পর তাঁর বিচার উপলক্ষে কালাচাঁদের সঙ্গে নবাবকন্যার আলাপের সূত্রপাত হয়।[৪৪] আলোচ্য পরিবর্তনের মূলে ঔপন্যাসিক দৃষ্টি ক্রিয়াশীল। দুলারীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্যে ঘটনার পরিবর্তন প্রয়োজনীয় ছিল। তার ফলে দুলারী ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক বিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি সজীব চরিত্র হয়ে উঠেছে। কালাচাঁদের সঙ্গে দুলারীর বিবাহ-প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন :

> 'দুলারী তাঁহাকে মুসলমান হইতে দিল না — সে নিজে হিন্দু হইল।'[৪৫]

প্রচলিত কিংবদন্তীতে ঔপন্যাসিক-মন্তব্য সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই অংশে লেখক স্ব-সমাজের বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি বলে ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

ঐতিহাসিক উপাদান বিচারের দিক দিয়ে রাণী ব্রজসুন্দরীকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, কালাচাঁদের পূর্ব-বিবাহিত জীবন, দ্বিতীয়ত, সুলতানের

দরবারে চাকুরী গ্রহণ এবং সুলতান কন্যার সঙ্গে প্রণয়, তৃতীয়ত, কালাচাঁদ-পরিত্যক্তা পূর্বপত্নী ব্রজসুন্দরীর উড়িষ্যায় মুকুন্দদেবের আশ্রয় গ্রহণ ও কালাপাহাড় কর্তৃক উড়িষ্যার ধ্বংস সাধন।

প্রথম শাখার ঐতিহাসিক উপাদান অপেক্ষাকৃত স্বল্প — ঔপন্যাসিক ইতিহাসের অপূর্ণতা আপনার কল্পনার সাহায্যে পূরণ করেছেন। শাখা কাহিনী সৃষ্টির কৌশল শচীশচন্দ্র চমৎকার ভাবে আরও করেছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রেই বিচিত্রপ্লাবী শাখা কাহিনী পরিণতির সঙ্গে সুসমঞ্জস ঐক্যবিধানে সক্ষম হয়েছে। সুলতান কন্যার সঙ্গে পরিণীত হওয়ার পূর্বে কালাচাঁদ বিবাহিত ছিলেন বলে কিংবদন্তীতে প্রকাশ। তিনি শ্রীপুর গ্রাম-নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ঔপন্যাসিক এই তথ্যের চুম্বকমাত্র গ্রহণ করে স্বকীয় কল্পনায় চিত্তচমৎকারী ঘটনার সাহায্যে উক্ত অংশ অনুরঞ্জিত করেছেন। কিংবদন্তীতে বিবাহ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ইতিহাস-নীরবতার সূত্র ধরে ঔপন্যাসিক তার কারণ নির্ণয়ের জন্যে বিস্তৃত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি কালাচাঁদের পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী সম্পর্কে ইতিহাস-নীরবতার কারণ সম্পর্কে কল্পনায় একটি সম্ভাব্য কাহিনী নির্মাণ করে মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছেন।[৪৬] কল্পিত কাহিনী লেখক এমন কৌশলে এঁকেছেন যে তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে পাঠক মনে কিছুমাত্র প্রশ্ন জাগে না। শচীশচন্দ্রের মতে, কালাচাঁদের পত্নী ব্রজসুন্দরীর সৌন্দর্য ও চরিত্র-স্খলনই তাঁকে পত্নীর প্রতি অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। উপন্যাসে এই মনোভাবের বিস্তৃত সমর্থন পাওয়া যায়।

উপন্যাসের তৃতীয় অংশে উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেব সম্পর্কে বিস্তৃত চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। ইতিহাসের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ চরিত্র প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। এখানে গ্রন্থ থেকে দুটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হল :

> 'তাঁহার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, তিনি বৎসরের অর্ধাংশ রাজকার্যে যাপন করিতেন, অপরার্ধ নিদ্রায় যাপন করিতেন।[৪৭]

'আবার, কেহ বলিয়াছেন, মুকুন্দদেবের চারিশত রাণী ছিল। মানুষের সকল গুণ থাকে না, মুকুন্দদেবেরও ছিল না। তিনি বিলাসী ও রমণী অভিলাষী ছিলেন।'[৪৮]

ইতিহাসে উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের স্বীকৃতি আছে। রিয়াজ-উস্-সালাতীন্ গ্রন্থের লেখক প্রথম ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন :

'For six months he admitted the public to his audience, and attended to the management of the affairs of his country, and for six months he gave his body rest, and went to sleep.'[৪৮]

সুলতান ইব্রাহিম সোলেমান কররানীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, রাজ্যচ্যুত সুলতান-পুত্র করিম শা ছদ্মবেশে কররানীর রাজ্যে ভ্রমণ করতেন। দুলারীর সৌন্দর্য প্রশংসায় তিনি একদা তাঁর উদ্যানে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ধরা পড়েন। আত্মপরিচয়ে অনিচ্ছুক করিম শা-কে কালাচাঁদ তাঁর গৃহে আশ্রয় দেন। পরে তিনি উড়িষ্যা রাজ্যের পক্ষাবলম্বন করে পিতৃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কালাপাহাড়ের হাতে নিহত হন। আলোচ্য কাহিনীটি ইতিহাস সম্মত নয়, করিম শা-র প্রেম এবং কালাচাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কাল্পনিক-ইতিহাস থেকে জানা যায় সুলতান ইব্রাহিম সোলেমানের কাছে পরাজিত হয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন এবং উড়িষ্যাধিপতি সেখানে তাঁর ভরণ-পোষণের জন্যে সম্পত্তি প্রদান করেন।[৫০]

উপন্যাসে দেখা যায় সোলেমান কররানী প্রথমে উড়িষ্যা-অভিযানে সম্মত হননি। ইতিপূর্বে ইসমাঈল গাজী উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। তখন কৃষ্ণ রায় উড়িষ্যায় ছিলেন না, তিনি ফিরে এসে ইসমাঈলকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেন।[৫১] কালাপাহাড়ের প্ররোচনায় কররানী শেষে অভিযানে স্বীকৃত হন। কালাপাহাড় ও কতলুখাঁ সসৈন্যে উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।[৫২] ইতিহাস থেকে জানা যায় রুকনউদ্দীন বরবকশাহের আমলে ইসমাঈল গাজী নামে তাঁর এক সেনাপতি উড়িষ্যা ও কামরূপ আক্রমণ করে

প্রথমবার পরাজিত হয়েছিলেন।[৫৩] কিন্তু কামেশ্বর তাঁর গুণে বিশেষ মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৫৪]

মুসলমান কর্তৃক উড়িষ্যা জয় সম্পর্কে লেখক একটি দেশদ্রোহিতার কাহিনীর অবতারণা করেছেন। কাহিনীর মাধ্যমে দেশদ্রোহিতা ব্যতীত মুসলমান কর্তৃক উড়িষ্যা জয় যে অসম্ভব ছিল, এ-কথাই উপস্থাপিত হয়েছে। আলোচ্য মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে অপর একটি উপন্যাসে[৫৫] পৃথ্বীরাজ-ঘোরীর সংগ্রাম-কেন্দ্রিক কাহিনীর মাধ্যমে পরিস্ফুট। এই প্রয়োজন স্ফুটতর করতে উড়িষ্যা-মন্ত্রী জনার্দন, রাজসভাসদ ভৃগুরাম, হরিকীর্তন ভূমিকাগুলি অঙ্কিত। বলাবাহুল্য, এই রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল স্বরূপ শচীশচন্দ্রের কাহিনীতে অনুসৃত হয়েছে।

জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস, দেবমূর্তির অবমাননা ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত ইতিহাসের কাহিনীই প্রধানত গৃহীত। ইতিহাসে দেখা যায়, জগন্নাথের মূর্তি পুরোহিতরা চিল্কা হ্রদের তীরস্থ কোন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কালাপাহাড় বহু অনুসন্ধানের পর গুপ্তস্থান আবিষ্কার করে মূর্তি স্বহস্তগত করেন।[৫৬] উপন্যাসে এই ঘটনা পরিবর্তিত আকারে কল্পিত। ব্রজবালা-নটবরের কথোপকথন থেকে তা বোঝা যায়ঃ

"তিনি (ব্রজবালা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক বলতে পার কি ললাটী, শ্রীবিগ্রহ হ্রদ গর্ভে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে কি না?

'না, মা আমি আমি জানিনে, নগরের ভিতর আমি ত যেতে পারছি নে।'

এমন সময় নটবর রক্তাক্ত কলেবরে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "প্রতিমা লুকান হয়নি, — 'তোমার কথা কেহ শুনে নি মা।'[৫৭]

ঘটনার পরিবর্তন কাহিনীর স্বার্থে প্রয়োজন হয়েছিল। উড়িষ্যায় দলাদলি, ব্যক্তিস্বার্থ ইত্যাদি চিত্র উপন্যাসে বিস্তৃত আকারে স্থান পেয়েছে।

উপন্যাসে কালাপাহাড়ের পরিণতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাহায্যে পরিকল্পিতঃ

সন্ন্যাসীর কণ্ঠ আবার গর্জিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "অন্ধকার ভেদ করিতে সমর্থ হইলে কালাচাঁদ, তবে কেন শক্তির গর্ব কর? ওই দেখ — সম্মুখে, নিকটে চাহিয়া দেখ, মহাশূন্যে তোমার মূর্তি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে

ওই দেখ, তোমার হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা একে একে খসিয়া পড়িতেছে।[৫৮]

কালাপাহাড়ের এই অন্তিম পরিণতি হিন্দু-লেখকদের কল্পিত কাহিনী মাত্র। উড়িষ্যার মহান্তি সম্প্রদায় কর্তৃক পরিকল্পিত এবং পরবর্তীকালে প্রচারিত। 'বিশ্বকোষে' কালাপাহাড়ের উপরোক্ত পরিণতি সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায়।[৫৯] জগন্নাথের মূর্তির শেষ পরিণতি সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ রয়েছে।

সোলেমান কররানী সম্পর্কে ঔপন্যাসিক মন্তব্য করেছেন :

'সলিমান আগন্তুক ও বিদেশী হইলেও ন্যায়পরায়ণ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। রাজকার্যে তাঁহার ঔদাস্য ছিল না।'[৬০]

ইতিহাসে সোলেমান সম্পর্কে প্রশংসাপাত লক্ষ্য করা যায় তাঁর আদর্শবাদ ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য। উল্লেখযোগ্য দুটি ইতিহাস থেকে এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় অংশ নীচে উদ্ধৃত হল। রিয়াজের মন্তব্য :

he was very energetic, industrious, and strict.[৬১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসে এ-সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে :

'The peace which he was able to enforce in this fertile province rapidly increased his revenue, and he devasted his leisure to promoting his subjects' happiness by doing justice.'[৬২]

শচীশচন্দ্র ইতিহাস সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন, সেগুলির অধিকাংশই মূলত ইতিহাস থেকে গৃহীত। যে-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় সেখানে কাহিনীর প্রয়োজনেই রূপান্তর সাধিত হয়েছে। উপন্যাসের পক্ষে তা অবশ্যম্ভাবী।

কালাপাহাড় বিষয়ক সমসাময়িক কাহিনীতে তাঁর প্রেম সম্পর্কে দুটি কাহিনীধারা লক্ষ্য করা যায়, একটি সোলেমান কন্যার সঙ্গে প্রেম, অপরটি সোলেমান ভ্রাতা তাজ খাঁর কন্যার সঙ্গে পরিণয়। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শেষোক্ত কাহিনী তাঁর উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন। ঘটনাপ্রবাহে কালাপাহাড় রাজধানীতে নবাব অদেশে বন্দী হন। সোলেমান-ভ্রাতা তাজ খাঁর কন্যা

নজিরণ কারাগারের পার্শ্বস্থ প্রাসাদে বাস করতেন সখীদের নিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কালাপাহাড়ের দুরবস্থার কথা জানতে পারেন এবং নিজের প্রাসাদে আনেন। তাঁর মুখে জলসেচন করায় জাত যায়। পরে উভয়ের অনুরাগ শেষ পর্যন্ত বিবাহে গিয়ে পৌঁছায়।[৬৩] প্রচলিত প্রবাদ-কাহিনীর সঙ্গে নাটকের এই অংশের ঘটনার কোন পার্থক্য নেই। কেবলমাত্র সোলেমান-কন্যা তাজ-কন্যাতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং নদীতীরের পরিবর্তে কারাগার তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের পটভূমি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

সোলেমান কর্তৃক কালাপাহাড়কে সেনাপতি নিয়োগ ও উড়িষ্যা বিজয়ের প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে উপন্যাস-গ্রথিত কাহিনীর কোন অমিল নেই। উপন্যাসে দেখা যায়, জগন্নাথের দগ্ধ মূর্তি ন্যায়রত্ন চাইলে কালাপাহাড় তাঁকে ফিরিয়ে দেন।[৬৪] সামাজিক কাহিনীগুলিতে অবশ্য এই ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। সেখানে আছে, দগ্ধ মূর্তি নদীতে ভাসিয়ে দিলে পাণ্ডারা দগ্ধ মূর্তি উদ্ধার করেন। এই পরিবর্তনে ঐতিহাসিক তথ্যের অবমাননা করা হয়নি, গুরুর প্রতি কালাপাহাড়ের ভক্তি-ভাব প্রমাণিত হয়েছে তাঁর সহজ মানবিক ব্যবহারে।

প্রচলিত কাহিনীতে কালাপাহাড়ের মৃত্যু-সম্পর্কে বিতর্কের শেষ নেই। এর একমাত্র কারণ, তাঁর পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক-ধারণার পরিবর্তে কাল্পনিক কাহিনীর প্রতি হিন্দুমানসের আকর্ষণ। শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসে হলায়ুধের নিক্ষিপ্ত বর্শায় আহত কালাপাহাড় পরে মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রবাদ-প্রচলিত মতাপেক্ষা এই চিত্র উপন্যাসের পক্ষে অধিকতর বাস্তব। নজিরণের মৃত্যু সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন,

> 'প্রভাতের[৬৫] ইচ্ছা ছিল, একবার নজিরনের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; কিন্তু তাণ্ডায় গিয়া শুনিলেন, সেনাপতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণের দুই তিন দিন পর, নজিরণ অনশন-ব্রত অবলম্বনে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।[৬৬]

বলাবাহুল্য, নজিরণের অনশন-ব্রতের মাধ্যমে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি ঔপন্যাসিকের কল্পনা-মণ্ডিত এবং এই কল্পনার মূলে বিজাতীয় রমণীকে হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি ভক্তিমতী রূপে দেখানোর উদ্দেশ্যটি বর্তমান।

যদুনাথ ভট্টাচার্য শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক চিত্র ও নাম — তিনি গ্রহণ করেছিলেন পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে। কালাপাহাড়ের পূর্ব নাম নিরঞ্জন, ডাকনাম রাজু, তাজখাঁর কন্যা নজিরণের সঙ্গে প্রেম ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত উপন্যাসের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই।

কালাপাহাড়ের নবাব দরবারে কর্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচ্য উপন্যাসে ব্যতিক্রম দেখা যায়। অন্যান্য উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে সোলেমান-দরবারে কালাপাহাড় পরিচিত হন এবং নবাব তাঁকে মনসবদার নিযুক্ত করেন, পরে তিনি সেনাপতি পদে উন্নীত হন। বর্তমান উপন্যাসে আছে, নিরঞ্জন ছদ্মবেশে অভয়সিংহ নামে তাণ্ডার বার্ষিক উৎসবে বীরত্ব প্রকাশ করায় নবাব তঁকে পাঁচশ অশ্বারোহীর নায়ক করেন।

নিরঞ্জন তাঁর স্বধর্ম-দ্রোহিতা ও নিষ্ঠুরতার জন্যে কালাপাহাড় নাম প্রাপ্ত হন। যদুনাথ এই মত গ্রহণ করেননি। নিরঞ্জন তাণ্ডায় অপূর্ব বীরত্ব দেখালে নবাব সন্তুষ্ট হয়ে বলেন,

> 'তুমি যেরূপ অচল অটল কালাপাহাড়ের ন্যায় ক্রীড়াক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলে, তাহাতে তোমার 'কালাপাহাড়' উপাধি হওয়া উচিত। আমি তোমাকে 'কালাপাহাড়' উপাধি দিলাম।[৬৭]

যদুনাথ এই পরিবর্তন সাহিত্য-ধর্মের দিক থেকে ঘটিয়েছেন — যে রাজনৈতিক বিতৃষ্ণার জন্য নিরঞ্জনের নাম 'কালাপাহাড়' হয়েছিল তা তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। সাহিত্যিক প্রয়োজনে তাঁর গ্রন্থে এই ধরণের ছোট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

অন্যান্য উপন্যাসের মত যদুনাথের গ্রন্থের কালাপাহাড়ের শেষ জীবনও বিতর্কমূলক। কালাপাহাড় মন্দির ধ্বংসের পর আত্মগ্লানি অনুভব করে নিজের মৃত্যু রটনা করে শিবির ছেড়ে পালিয়ে যান এবং পরে সন্ন্যাসী হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন জ্ঞানানন্দ স্বামীর শিষ্য হয়ে। তাঁর স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুও অনৈতিহাসিক।

[সাহিত্যিক মূল্য]

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃতি বিচারে কালাপাহাড় শ্রেণীর উপন্যাস মূলত অনৈতিহাসিক। ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতা, উপন্যাসগুলিকে ঐতিহাসিক-মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে। উপন্যাসগুলির অবলম্বন ছিল প্রচলিত কিংবদন্তী। ঔপন্যাসিকেরা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন এই শ্রেণীর কিংবদন্তীর দ্বারা এবং অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁরা গ্রহণ করেছেন ঐতিহাসিক ঘটনা। ইতিহাসোক্ত কাহিনীর মধ্যে কালাপাহাড়ের সোলেমান-দরবারে কর্ম প্রাপ্তি, প্রধান সেনাপতি হিসাবে উড়িষ্যা বিজয়ই প্রধান ঘটনা। স্বল্প ঐতিহাসিক কাহিনীতে উপন্যাস রচনার উপাদান ছিল না বলে স্বাভাবিক ভাবে কল্পনাশ্রয়ী ঔপন্যাসিক-মন কিংবদন্তীর প্রশ্রয়ে ঘনীভূত আকার লাভ করেছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে লেখক যে-পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তা কী পরিমাণে ঐতিহাসিকতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে, সে বিচারই হল প্রকৃত সমালোচনার মানদণ্ড।

রসিকচন্দ্র বসু ছাড়া অপর তিনজন ঔপন্যাসিক কিংবদন্তী প্রচলিত কাহিনী উপন্যাসে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করেননি। শ্রীশচন্দ্র ও শচীশচন্দ্র মূল কাহিনী থেকে অতি-দূরে সরে গিয়েছিলেন। লেখক সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনায় এই দিক বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কালাপাহাড় কেন্দ্রিক প্রথম উপন্যাস রচনা করেছিলেন বলে তাঁর কাহিনী ধারায় বহু মৌলিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কালাপাহাড়ের প্রেম সম্পর্কে দ্বি-মত প্রচলিত ছিল ; প্রথমত সোলেমান-কন্যা, দ্বিতীয়ত তদীয় ভ্রাতা তাজখাঁর কন্যার সঙ্গে তাঁর প্রণয় সম্পর্ক ছিল বলে কিংবদন্তী আছে। শ্রীশচন্দ্র দ্বিতীয়োক্ত কাহিনী গ্রহণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসে ঐতিহাসিক যোগাযোগ ছাড়া সম্পূর্ণ কাহিনী অনৈতিহাসিক উপাদানে গঠিত এবং তিনি কৌশলের সঙ্গে উভয় কাহিনীর সম্মিলন ঘটাতে পারেননি। উপন্যাসে কালাপাহাড়ের কাহিনী গ্রহণ — ইতিহাস-অখ্যাত, বীর্যহীন সুত প্রভাত-কাহিনী মুখ্য। প্রভাত-কাহিনী কেবল

যে রহস্যমণ্ডিত তাই নয় — তাঁর চরিত্র অস্ফুট, দ্বিতীয়ত প্রধান চরিত্র হিসেবে তিনি অযোগ্য। তিনি মুকুন্দদেবের পক্ষাবলম্বন করে আপন সহোদর কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করেছিলেন। লেখকের দৃষ্টিতে তিনি 'জাতীয় বীর।' উপন্যাসে এই চরিত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তিনি কালাপাহাড়ের দ্বিতীয় জীবনের শূন্যস্থান পূরণকারী। অর্থাৎ কালাপাহাড় যদি মুসলমান না হতেন, তা'হলে তাঁর কার্যক্রম কী হত, তাই প্রভাত-চরিত্রের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

কালাপাহাড় পূর্ব-জীবনে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। মন্দিরের সামনে কাজী গরু জবাই করলে তিনি তাঁর হিন্দু-ধর্মবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সোলেমানের দরবারে অভিযোগ করেন। কিন্তু কাজীর বিরুদ্ধতায় কারাগারে নীত হন। জীবনের এই কাল পর্যন্ত কালাপাহাড়ের এক রূপ — ধর্মের জন্যে, জাতির জন্যে তাঁর প্রাণ উৎসর্গিত। কিন্তু পরবর্তীকালে নজিরণের সঙ্গে বিবাহ এবং সোলেমানের সেনাপতি-রূপে উড়িষ্যার ধ্বংসসাধন, কালাপাহাড়ের দেব-দ্বেষী মনের বিকৃত রূপ। এই শ্রেণীর চরিত্রকে নায়ক করে কোন জাতিপ্রিয়-লেখক সন্তুষ্ট হতে পারেন না। শ্রীশচন্দ্রও হননি। সেজন্যে এই সময়ে কালাপাহাড়ের বিকল্প রূপ হিসাবে প্রভাতকে দাঁড় করিয়েছেন — যিনি স্বজাতি ও স্বধর্ম রক্ষার্থে বাঙলাদেশ পরিত্যাগ করে উড়িষ্যায় উপনীত হয়ে ধর্মদ্রোহী কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন। কালাপাহাড় তাঁকে মাতৃভূমি ছেড়ে দূরাঞ্চলে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করায়ঃ

> 'অবিচলিত ভাবে প্রভাত উত্তর দিলেন, 'যেখানে হিন্দুর বাস, যেখানে হিন্দুর ধর্মকর্ম অক্ষুণ্ণ, সেই হিন্দুর দেশ। হিন্দুর জন্য, হিন্দুর প্রাণ-পণ অসম্ভব নয়। হিন্দু হয়ে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ, মুসলমানের জন্য প্রাণ-পণ, সেইটাই বরং অসম্ভব।[৬৮]
>
> 'স্বধর্মরক্ষা ব্রাহ্মণের ব্রত, স্বধর্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ পাপ নয়।'[৬৯]

প্রভাতের 'হিন্দুর জন্য প্রাণপণ' উক্তির মধ্যে কংগ্রেসের সমকালীন ভূমিকার প্রতি বৈরাগ্য এবং হিন্দু মেলার-কার্যক্রমের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে। সেকালে কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান যুক্তস্বার্থের ভূমিকা অনেক জাতীয়তাবাদী চেতনাসম্পন্ন নাগরিকের কাছে সুখপ্রদ হয়নি।[৩] উড়িষ্যা-অধিপতি মুকুন্দরায়

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে কালাপাহাড়ের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে প্রভাতের মত তিনিও শচীশচন্দ্রের গ্রন্থে জাতীয়বীরের মর্যাদা পেয়েছিলেন।

উপন্যাসে প্রথম থেকেই প্রভাতকে চিত্রিত করা হয়েছে জাতীয় বীরের প্রতীক হিসেবে। বন্ধু যোগেশের সঙ্গে কথোপকথনকালে প্রভাতের মনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে ঃ

> 'প্রভাত' প্রাণ দেওয়া নয়, যোগেশ। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তা হ'লে আমার স্বর্গ লাভ হবে।[৭০]
>
> 'দেশের বিপদের সময় প্রাণ দিয়ে উপকার করা আমি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জেনেছি।[৭১]

আন্তঃ দেশীয় হিন্দু-জাতীয়তার প্রতি প্রভাতের শ্রদ্ধাবোধ ঃ

> 'যোগেশ! তুমি ভ্রান্ত হয়েছ। উড়িষ্যা কি আমাদের দেশ নয়? যেখানে হিন্দুরাজার অধিকার, হিন্দুর বাসস্থান, সেইখানেই আমাদের দেশ, যখন কাপুরুষ লক্ষ্মণ সেন সপ্তদশ জন অশ্বারোহীর ভয়ে নবদ্বীপ হতে পলায়ন করেছিল, তখন যদি পৃথিবীতে থাকতেম, তা'হলে নিশ্চয়ই এ-জীবন দেশের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করতেম। কিন্তু সে ত সুদূর-গত অতীতের কথা! এখন যদি উড়িষ্যায় হিন্দু-রাজার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, তা'হলে আমাদের স্বাধীন দেশ বলে মনে একটা অহঙ্কার থাকবে, ইচ্ছা হলে বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করে, এইখানে এসে বাস করতে পারবো, তখন 'স্বাধীনরাজ্যের প্রজা' বলে মনে অনেকটা বল থাকবে।'[৭২]

প্রভাতের মন্তব্যের মধ্যে হিন্দু-জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ দেশকালের পরিবর্তে সর্বদেশীয় হিন্দু-চেতনার কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। প্রভাত হিন্দু-মেলার মর্মবাণীর বিশিষ্ট প্রতীক। শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশ হওয়ার পূর্বে পাক-ভারতে অখণ্ড-হিন্দু ও অখণ্ড-মুসলমান চেতনার আন্দোলন শুরু হয়েছিল হিন্দু-মেলা ও প্যান ইসলামিক আন্দোলনের দ্বারা। শ্রীশচন্দ্র উভয় আন্দোলনই প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন বলে অখণ্ড হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রকাশে দ্বন্দ্বমুক্ত হতে পেরেছিলেন। প্রভাত-চরিত্র তার অন্যতম সাক্ষ্য। যদুনাথ ভট্টাচার্যের মত তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। অবশ্য, কেবল যে প্রভাত তা নয় — অন্যান্য চরিত্রের মধ্যেও স্বাজাত্য-বোধ ও স্বজাতিপ্রীতি

লক্ষ্য করা যায়। হলায়ুধ মিত্র স্বাধীনতা রক্ষার্থে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

> 'এই স্বাধীনতাটুকুর সঙ্গে সমগ্র উড়িষ্যাবাসীর সুখ-দুঃখ সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত; লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের অদৃষ্টচক্র এই স্বাধীনতা দ্বারা নিয়ামিত। আমরা যদি এখন সেই স্বাধীনতা হারাই, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে আমাদের গৌরব বিনষ্ট হইবে, পাঠানের পদতলে উৎকল-বাসীর অভিমানোন্নত মস্তক প্রতিনিয়ত বিলুণ্ঠিত হইবে ··· মুসলমানগণ বিধর্মী. অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক। হিন্দুর জাতিনাশ, হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্তি-ধ্বংস, হিন্দুর পবিত্র দেব-মন্দির স্থলে মসজিদ নিম'াণ তাহাদের দৃঢ় ব্রত। ... এস ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে মিলিয়া এই দেব-মন্দিরে দেবতার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করি যেন পাঠানগণের আক্রমণ দিনে আবার আমরা এমনিভাবে মিলিত হই, এমনিভাবে মিলিত হইয়া স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করি, আপন আপন হৃদয়-রক্ত দান করিয়া জন্মভূমির ঋণ পরিশোধ করি।'[৭৩]

কালাপাহাড় উপন্যাসের কূট চরিত্র। নজিরণের বিবাহ-মূলে ছিল রাজনৈতিক কারণ — চিত্তদৌর্বল্য নয়। সেজন্যে তাঁর মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ব্যক্তিসত্তা অনুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা। তিনি নিজের ধর্মান্তর সম্পর্কে ন্যায়রত্নের কাছে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

> ন্যায়রত্ন। 'মুসলমান রাজার অত্যাচার-হেতু তুমি মুসলমান; তবে যে কেউ বলতো — তুমি কোন মুসলমান রাজবংশীয়া রমণীর কুহকে পড়ে এই যবন ধর্ম আশ্রয় করেছ!' কালাপাহাড়। 'সেটা লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস।'

পরবর্তীকালে কালাপাহাড়ের বক্তব্যে মুসলমান হওয়ার নেপথ্য কারণ আরও স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কালাপাহাড় যবন-রাজের পাশব বলে, "আমি এখন স্বধর্মদ্রোহী, স্বদেশদ্রোহী বিদ্রোহী যবন"[৭৪] বললেও এ উক্তির পশ্চাতে কোন প্রকৃত সত্য নেই। কেননা তার স্বধর্ম-ত্যাগের পশ্চাতে ছিল স্বধর্মগত অনুদারতা, বিধর্মী-রাজের প্ররোচনা বা অত্যাচার নয়। ঔপন্যাসিক এই উক্তি করে কালাপাহাড়ের বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারেননি। উড়িষ্যা ধ্বংসের পর কালাপাহাড় নিজের গুপ্ত স্বভাবধর্ম ব্যক্ত করেছেন ঃ

'মুসলমান-রাজ্য ধ্বংসই আমার দৃঢ়ব্রত। আমার জীবনের এই মহান উদ্দেশ্যটা সমস্ত পৃথিবীর অজ্ঞাতসারে লুকাইতছিল।— আমি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি — আমি যবন-রাজ্যে দাস বটে, কিন্তু যবন-রাজের সর্বনাশ সাধনেই আমার জীবন সংকল্পিত।'

'ভাই, যেদিন মুসলমানেরা বলপূর্বক [৭৫] আমায় ধর্মভ্রষ্ট করলে, সেইদিন হতে প্রতিজ্ঞা করলাম — মুসলমান রাজ্যের মূলোচ্ছেদ করবো। কিন্তু ধনহীন, বলহীন, পথের ভিখারী আমি — সুতরাং কৌশলে কার্য-সাধনের চেষ্টা করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম হিন্দুজাতি ধর্মগত প্রাণ, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, তাদের সেই ধর্মে আঘাত করলে, দেশব্যাপী বিদ্রোহ উপস্থিত হবে। আর, সেই জন্যেই দেবমূর্তি-নাশের জন্য দেবমন্দির ধ্বংসের জন্য — আমার অসি নিষ্কোষিত হয়েছিল।'[৭৬]

সমকালীন রাজনৈতিক-চেতনা লেখকের মনে হতাশা এনে দিয়েছিল। এই হতাশার কারণ, তিনি রাজনীতি বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কর্মমধ্যে হিন্দু জাতি ও ধর্মের সার্বিক বিমুক্তির পরিচয় পাননি। ইংরেজ-শাসিত রাজ্যে জাতীয় স্বাধীনতা যে দূর কল্পনার বস্তু তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। কালা-পাহাড়ের অন্তিম উক্তি তার সাক্ষ্য :

'মুসলমান রাজার সহিত আর কোন প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ করো না ; হিন্দু জাতির আর উন্নতির আশা নাই, বহু সহস্র বৎসরেও এ পরাধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করতে পারবে কি না, সন্দেহ।'[৭৭]

ইংরেজ আমলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনায় যে হতাশা জেগেছিল, উপরোক্ত উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কালাপাহাড় উপন্যাসে ঊষা-প্রভাতের বিচিত্র জীবন ও প্রেম-কাহিনী অধিকতর বিস্তৃত আকারে বর্ণিত। কালাপাহাড় মুখ্য চরিত্র হলেও তাঁর কাহিনীর চেয়ে পূর্বোক্ত কাহিনীর ক্ষেত্রেই লেখকের প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। ঊষার বয়স তার প্রেম-পরিণতির পক্ষে বিশেষ বাধা এবং তার ফলে অধিকাংশ সময়ে নায়কের মধ্যেই প্রেমাবেগ, চিত্তচাঞ্চল্য ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত। প্রেম-প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রভাতের প্রেম অনেকাংশে বৈষ্ণব প্রেমের মত। তাঁর প্রেম-প্রকৃতির নমুনা :

'প্রভাত, সরোবর-তীরে আপনার চিত্ত হারাইয়া হৃদয় ভরা চিন্তা লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সকল চিন্তাই উষাময়।
পলে পলে উষার সেই কণ্ঠধ্বনি বাজিতেছে: উষার ছায়াময়ী প্রতিকৃতি যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। সঙ্গীহীন প্রভাত, প্রাণের প্রাণ কি যেন ক্রটি পাইয়াছিলেন, — আবার তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রভাত তাঁহার জীবন-সর্বস্ব দিতে চাহিয়া খুলিয়া বলিলেন না, উষা, একবার প্রভাতকে বল — আমি তোমাকে ভালবাসি।[৭৮]

এবং

'কুসুম শয্যায় বসিয়া, জাগিয়া স্বপ্ন দেখিলেন — যেন তিনি এক নিভৃত প্রেম-কুঞ্জে বসিয়া আপনার হৃদয়সিংহাসন স্বর্গের অতি কোমল মন্দার-মালায় সাজাইয়া উষার সম্মুখে পাতিয়া দিয়াছেন — উষা তাহার উপর বসিয়া তাহা অপেক্ষাও সুকোমল আপনার হৃদয়-আসন খুলিয়া বলিতেছে — এস প্রভাত! দুইজনে এই আসনের উপর বসি, এ জগতে তুমি আমার, আমি তোমার; দেখিও, যেন কখনও ভুলিও না; এস, দুজনার প্রাণ একত্র করিয়া প্রণয়রজ্জুতে গ্রন্থি দিয়া রাখি।'

বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালী-জীবন কিভাবে আন্দোলিত হয়েছিল প্রভাতের উক্তি তার প্রমাণ। যিনি দেশোদ্ধার ব্রতে দীক্ষিত, তাঁর পক্ষে বালিকার প্রেমে পড়ে দিবা-স্বপ্ন দেখা পুরুষত্বহীনতার পরিচায়ক। হেমচন্দ্রের তবু পুরুষত্ব ছিল — প্রভাত তা থেকেও বর্জিত। প্রভাত-চরিত্রে ভাবাবেগের পরিমাণ কম থাকলে এই দুর্বলতা দেখা দিত না।

কালাপাহাড় কেন্দ্রিক অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় যদুনাথ ভট্টাচার্যের উপন্যাসের একটি রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে। শচীশচন্দ্র ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসে যদুনাথের মত সুগ্রথিত কাহিনী পাওয়া যায় না। উপন্যাস রচনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল বিশ শতকের জাতীয়-চেতনা, যদুনাথের উপন্যাসে এই সুর অতিশয় স্পষ্ট। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' (ভূমিকা) অংশে লেখক আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেছেন পাঠকদের কাছে:

'ইতিহাসের কঙ্কালে দেশীয় লোকের সময়োচিত মনোবৃত্তি ও বৈদেশিক আচরণের মেদ-মাংস দিয়া এই উপন্যাস গঠিত হইল। ... ... কালাপাহাড়ের

প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বাসযোগ্য উপকরণের অভাবে উপন্যাসের আকারে পরিসমাপ্তি করিলাম।'

যদুনাথ হিন্দু-মুসলমান মিলন তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বিশ শতকের রাজনৈতিক আন্দোলন হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনার আদর্শ নিয়েই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। কংগ্রেসের বৃহৎ পটভূমিকায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই যোগদান করেছিল স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনা জাগার পূর্বাহ্ন পর্যন্ত। যদুনাথ সেই বাণীকেই বহন করেছিলেন কাহিনীর মধ্যে। কালাপাহাড় প্রথম জীবনে হিন্দু-চেতনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই চেতনা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলন চেতনায় রূপান্তরিত হয়। তাঁর পূর্ব-চেতনার স্বরূপ বোঝা যায় স্ত্রী যোগমায়ার মন্তব্য থেকে :

'তিনি (কালাপাহাড়) সর্বদাই ভাবেন, ভাবিতে ভাবিতে বলেন, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার হিন্দু মরিয়া আছে, তারা আর জাগিবে না—প্রতাপ, তুমি দেশে এস। তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলেন, জাগগো বাঙ্গালা জাগো। সকলে জাগো, একমত হও। জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনী সুধা সেবন কর। আবার কাঁদিয়া বলেন, হায়, হায়, হায়! এ দেশে সংগ্রাম নাই, মহারাজ প্রতাপ নাই, ভিষক ব্যতীত এ অসার মৃতদেহে কেমন করিয়া জীবনী শক্তি আসিবে? এইরূপ সকল রাত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকেন আর কাঁদেন।'৮১

পাক-ভারতে জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যেই কালাপাহাড় কেন্দ্রিক জাতীয় চেতনা ছিল। একশ্রেণীর মুসলমানদের মত হিন্দুরা হিন্দু জাতীয়বাদ অভ্যুত্থানের কথাই চিন্তা করতেন :

এ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন ;

'সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান, খ্রীস্টিয়ান প্রভৃতির এ দেশের উপরে কোনও দাওয়া দাবী আছে, ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। ইংরাজ যেমন পরদেশী পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এদেশের নবশিক্ষিত লোকেরা এদেশের মুসলমান এবং খ্রীস্টিয়ানকেও সেইরূপ পরদেশী বলিয়া মনে করিতেন। ... ... আর এই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই স্বর্গীয় রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয়ের হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন বক্তৃতা লিপিবদ্ধ হয়। সেই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের

গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য কেশব চন্দ্রের ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধির প্রতিবাদ করেন। আর সেই স্বাদেশিকতার আদর্শের প্রেরণাতেই নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দু-মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই নামের দ্বারাই তাঁহার স্বাদেশিকতার আদর্শের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।'৮২

বালগঙ্গাধর তিলক, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি একই আদর্শের পূজারী।

কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যদুনাথ কালাপাহাড় চরিত্র অঙ্কিত করেছেন। কালাপাহাড়ের আদর্শ ছিল পাক-ভারত হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দেশ, উভয়ের সমান অধিকার — সেই ভাব প্রচার করে উভয় জাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা। উদাহরণ দিয়ে তাঁর সমন্বয়ধর্মী জাতীয় চেতনা পরিস্ফুট করা যায়।

কালাপাহাড় ও যোগমায়ার (কালাপাহাড়ের পূর্ব স্ত্রী : হিন্দু)কথোপকথন : 'নিরঞ্জন।৮৩ মুসলমানকে এত ঘৃণা কর কেন? ... সকলেই মানুষ, সকলেই ঈশ্বরের জীব। ... কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন, কদাচারী লোকমাত্রেই ঘৃণার পাত্র, তাহার হিন্দুও নাই, মুসলমানও নাই। মনটা একটু বড় কর, জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ কর। যোগমায়া! আমি ত মুসলমানকে ঘৃণা করি না। মুসলমানের মহম্মদ একজন অসাধারণ লোক। কোরানের আল্লা ও উপনিষদের ব্রহ্ম এক। অভ্যাসের দোষে, আচারের প্রভেদ, খাওয়া পড়া, ওঠা বসায় আমার মুসলমানের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছা করেনা।৮৪

কালাপাহাড়ের উক্তি থেকেই বোঝা যায় যদুনাথ তৎকালীন জাতীয়তাবাদ আন্দোলন দ্বারা কি-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কালাপাহাড় হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতু। ভাটের গানেও একই মতবাদ প্রতিধ্বনিত :

'পাঠান হিন্দুর ঐক্য প্রয়োজন।
নহিলে হেথায় থাকে নাকো ধন॥
মরিছে মরিছে লোক অগণন।
একতা অভাবে এ দুখ হায়॥'৮৫

কালাপাহাড় বরেন্দ্র-ভূমির বিদ্রোহী জমিদারদের বিদ্রোহ দমন করে তাঁদের সামনে বক্তৃতায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আদর্শই তুলে ধরেছেন :

'এখন আমাদিগের কি করা কর্তব্য? এখন আমরা গৃহবিচ্ছেদ ভুলিয়া — জাতীয় ধর্ম ও পার্থক্য ভুলিয়া — চর্য — পার্থক্য ভুলিয়া — এক হইব; বাঙ্গালা হিন্দুর দেশ, এখন পাঠানেরও দেশ; হিন্দু-মুসলমান এক বঙ্গমাতার সন্তান, হিন্দু-মুসলমান দুই ভাইয়ে গৃহ-বিচ্ছেদ সর্বনাশের মূল, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সর্বনাশের আকর।[৮৬]

সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করলেই কালাপাহাড় প্রস্তাবিত হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা যাবে।[৮৭]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কালাপাহাড় হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রস্তাবক হওয়া সত্ত্বেও সর্বক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হন নি। এই দ্বন্দ্বমুখর চেতনা ছিল বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল দুর্বলতা। যদুনাথ এই স্বাভাবিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। যোগমায়ার কাছে কালাপাহাড়ের উক্তি তার প্রমাণ:

'দেখ মায়া! শান্তি-সুখ তোমারও গিয়েছে, আমারও গিয়েছে।··· এখন আমার শান্তি তোমাতে। তুমি আমার ধর্মপত্নী, তুমি আমার বাল্যসখী। তুমি আপন, নজিরণ এখনও পর। নজিরণকে ভালবেসেছি কি না, বলতে পারি না, শার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, একথা আমি অবশ্য — স্বীকার করব।··· নজিরণ বৈঠকখানা, তুমি শয়ন-ভবন।··· নজিরণ সুরা, তুমি সুধা।'[৮৮]

কালাপাহাড়ের উক্তি বিংশ শতাব্দীর সমন্বয়বাদী আন্দোলনকারীদের দ্বিধাযুক্ত মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয়। সমন্বয়ী মতবাদ সত্ত্বেও সবাই হিন্দু-জাতীয়তাবাদের মোহ সর্বাংশে ত্যাগ করতে পারেন নি, তার ফলে জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের আদর্শ প্রতি পদে খণ্ডিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-চেতনা হয়েছে বহু প্রসারিত। এই দ্বন্দ্ব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের অসাফল্যের মূল কারণ। সেজন্যে কালাপাহাড়ের উক্তির গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান। 'নজিরণ বৈঠকখানা' তুমি শয়ন ভবন; জাতীয়তাবাদ আন্দোলন কারীদের কাছে শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের স্থান হয়েছে বৈঠকখানায় অর্থাৎ হৃদয়ের বাইরের ঘরে। স্বার্থের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত আন্দোলন সম্ভব নয়, দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য মুসলমানদের

বেছে নিতে হয়েছিল পৃথক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ — তারই ফলে মুসলিম লীগের জন্ম, আলিগড় মুসলিম কলেজের সৃষ্টি, খিলাফত আন্দোলনের প্রবর্তন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধগত দিক এবং হিন্দু মানসিকতা তুলে ধরেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধে ঃ

> 'আমি যখন আমাদের জমিদারি সেরেস্তায় প্রথম প্রবেশ করলেম তখন একদিন দেখি, আমার নায়েব তাঁর বৈঠকখানায় এক জায়গায় জাজিম খানিকটা তুলে রেখে দিয়েছেন। যখন জিজ্ঞেস করলেম, এ কেন, তখন জবাব পেলেম, যে-সব সম্মানী মুসলমান প্রজা বৈঠকখানায় প্রবেশের অধিকার পায় তাদের জন্য ঐ ব্যবস্থা। এক তক্তপোষে বসতেও হবে অথচ বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা পৃথক।'[৮৯]

সলিম শা, জ্ঞানানন্দ স্বামী ও নজিরণ — উপন্যাসের এই চরিত্রত্রয় নিঃস্বার্থভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যে প্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সলিম শা গান্ধীর আদর্শে পরিকল্পিত। বিশ শতকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনায় গান্ধী যে ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় সলিম শা ও জ্ঞানানন্দ স্বামী চরিত্রে। এঁরা উভয়েই সংসারত্যাগী, স্বার্থত্যাগী, — হিন্দু-মুসলমান মিলন-কামনার পথিক, উদ্ধৃতি দ্বারা এঁদের ভূমিকার রূপটি অনুধাবন সহজ হবে।

সলিম শা নজিরণের কাছে মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

> 'হিন্দু-মুসলমানে আর কতকাল যুদ্ধ চলবে। আর কতদিন ভারতমাতা নর-শোণিতে কলঙ্কিত হবেন? আমার ফকির জীবনের উদ্দেশ্য হিন্দু-মুসলমানের একতা সাধন, — ভারতের প্রকৃত বলসঞ্চয়। মা, তুমি আমার সেই তরীর কর্ণধার, আমার নিরঞ্জন তাহার বহিত্র বাহক।.... এক্ষণি যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, সে কেবল হিন্দু-মুসলমানের একতা সাধনে হবে।..... হিন্দুর গোঁড়ামি একটু কমুক, মুসলমানের হিন্দু-বিদ্বেষ একটু হ্রাস হউক, উভয়ের মিলনের জন্য মাঝামাঝি একটি ধর্ম — ঈশ্বরের ভক্তির ধর্ম প্রবর্তিত হ'ক।[৯০]

সলিম শা হিন্দু-মুসলমানের মিলন-তীর্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে লোক সংগ্রহ করে ফুলবাড়ি নামে এক জায়গায় 'ফকিরগড়' নামে একটি নগর তৈরী করেন।

অনেক স্বদেশ বিতাড়িত ভূপতিও এখানে আশ্রয় নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রচেষ্টা করতে থাকেন।[৯১] জ্ঞানানন্দ স্বামীর সঙ্গে সলিম শার কথোপকথন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'ফকির। উদ্দেশ্য কি?

স্বামী, মানবের পতিত নিবারণ ও পতিত নরের উদ্ধার-সাধন।

ফকির। অত্যাচার উৎপীড়ন হতে দেশে ঘোর অধর্মের অনুষ্ঠান হচ্ছে। হিন্দু পাঠানের মধ্যে ঘোর বিদ্বেষানল জ্বলছে।··· ··· আসুন, উভয়ে মিলিয়া বিদ্বেষের আগুন নিবাতে চেষ্টা করি, হিন্দু-পাঠানে এক করতে চেষ্টা করি। আমার কোরানের শিক্ষায় আর আপনার উপনিষদের ধর্মে প্রভেদ দেখি না।[৯২]

হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সলিম শা নিরঞ্জন ও নাসিরণের বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। সম্রাট আকবর বহুদিন পূর্বে একই কারণে রাজপুত মোগলদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। কবির শা নিজের পরিকল্পনার প্রকাশ করেছেন সরল ভাবে:

'নিরঞ্জনকে মুসলমান করব। নিরঞ্জনের গুণে পাঠানদিগকে মুগ্ধ করব। পাঠান দল হিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হবে, তারপর হিন্দুর ঘরের কথা জানা, পাঠানের ঘরের কথা জানা, বেদ-বেদান্তের পণ্ডিত, কোরানের মৌলভী, রায়-ঠাকুরকে দিয়ে হিন্দু-পাঠানের মিলন সাধন করব।'[৯৩]

নজিরণ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সেতু। মুসলমান নবাব-কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না — তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদী। পরধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল। উপন্যাসে তাঁর প্রতিটি আচরণ এ-কথার সাক্ষ্য দেয়। তিনি কালাপাহাড়ের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবের নিন্দা করে তাঁর প্রকৃত ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

'অত্যাচারে কি কখন হিন্দু মুসলমান হবে? প্রেমের বন্ধন অতি দৃঢ়, অত্যাচার কোন বন্ধনই হতে পারে না।··· ··· অন্যায় যুদ্ধে কাশী নষ্ট করেছ। ডাকাতের মত পড়ে গ্রাম, ঠাকুর, পুঁথি পোড়াচ্ছ।'[৯৪]

হিন্দু-মুসলমান মিলনকামী মনোভাব ও স্বদেশপ্রেম-বোধ নিম্নলিখিত বক্তব্যে সহজলভ্য:

'হিন্দু ভ্রাতৃগণ! মুসলমান ভ্রাতৃগণ! যদি দেশের কল্যাণ করিতে চাও, যদি বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে চাও, যদি মোগল দস্যুগণকে ফুৎকারে উড়াইতে চাও, তবে হিন্দু মুসলমান এক হও, এই উদ্দেশ্যে সকলে সমবেত হও, হিন্দুর শিক্ষা, সভ্যতা ও সুবুদ্ধির সহিত পাঠানের শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতার যোগ হউক, মণি-কাঞ্চনের যোগ হউক।'[৯৫]

এখানে 'মোগল' শব্দ ইংরেজের বিকল্পরূপে ব্যবহৃত। সমন্বয়বাদীদের মনোভাব ও দেশপ্রেম উপরোক্ত উক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করেছে।

বিংশ শতাব্দীর জাতীয়বাদ-আন্দোলনে যে মানসিক-দ্বন্দ্ব নিহিত ছিল উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমন্বয়পন্থীদের পাশাপাশি তা প্রকাশ লাভ করেছে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিক প্রতিনিধি হচ্ছেন যোগমায়া, কালাপাহাড়ের মা প্রভৃতি। যোগমায়া হিন্দু-সংস্কারকে কোন মতেই বর্জন করতে পারেননি বলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে নিজের সংস্কার-বোধকে জাগ্রত রেখেছেন। তিনি সমন্বয়ের পরিবর্তে প্রাচীন জাত্যভিমান পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। কালাপাহাড় হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করলে তাঁকে যোগমায়া স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি।

'আপনি আর যা বলবেন, আমি তাই শুনব, কিন্তু আর জীবনে আপনাকে স্পর্শ করব না। আপনার সঙ্গেও যাব না। আপনি দেখা দিলে সুখী হব, মনে মনে আপনার পূজা করব। আপনি কাতর হয়ে কিছু বলবেন না। ··· নজিরণেই আপনি সুখ, শান্তি দুই পাইবেন, আমায় আপনি ভুলে যাউন।'[৯৬]

কালাপাহাড়ের ধর্মান্তরের মূলে ছিল হিন্দু-ধর্মের গোঁড়ামি। স্ত্রীকে তিনি সঙ্গে নিতে চাইলে হিন্দু-মুসলমান সহ-অবস্থান যে সম্ভবপর নয় — তার প্রতি যোগমায়া ইঙ্গিত করেন। স্ত্রীর অনড় মনোভাবের জন্যে ক্রুদ্ধ কালাপাহাড় বলেন:

'তোমার হিন্দুগ্রন্থ মাত্র রাখব না, সমস্ত পোড়াব। হিন্দুধর্ম যা, মুসলমানের ধর্মও তাই।'[৯৭]

সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কালাপাহাড় চরিত্রাঙ্কনে এক অদ্ভুত মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকেই শেষ জীবনে কালাপাহাড়ের মুখ দিয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে

তিনি, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে তাদের সচেতন করে তোলার জন্যেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তাঁর এই ছদ্মবেশের সঙ্গত কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা, পূর্বে দেখা যায় যে, তিনি নবাব-কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন এবং হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির জন্যে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। সেখানে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। যদুনাথের কালাপাহাড়ও উপরোক্ত ত্রুটিমুক্ত নন। নবাব-কন্যাকে বিয়ে করা এবং মুসলমান হওয়া সম্পর্কে তিনি মত ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্তভাবে ঃ

> 'নজিরণ, তোমার প্রেমের গভীরতা—অতলস্পর্শী গভীরতা, বিশুদ্ধতা, স্থিরতা, দৃঢ়তা, আমি সম্পূর্ণ অনুভব করলেম।··· ফকির সাহেব, আপনি কল্য প্রত্যুষে ঘোষণা করবেন, অস্ত গমনের পূর্বে আমি নবাবের অনুমতি লয়ে নজিরণের পাণিগ্রহণ করব।'[৯৮]

অথচ পরবর্তীকালে কালাপাহাড়ের মুখে অন্যপ্রকার উক্তি শোনা যায় ঃ

> 'আমি রূপের মোহে, ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে মুসলমান হই নাই। আমি হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচার দেখিয়া, হিন্দুর এরূপ হীন, জীবনহীন-শৃঙ্খলাহীন অসাড় অবস্থা দেখিয়া হিন্দুকে জাগাইবার জন্য, হিন্দু পীড়নকারী মুসলমান হইয়াছি। মুসলমানের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, মুসলমান কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি।'[৯৯]

আসলে, কালাপাহাড়ের দ্বন্দ্ব বিশ শতকের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনকারী হিন্দুর মানসিক দ্বন্দ্ব। এই মানসিক দ্বন্দ্বের জন্যেই শেষ পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের জাতীয়তাবাদ-আন্দোলন ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত করেছে।

যদুনাথ ভট্টাচার্য শ্রীশচন্দ্রের কাহিনীদ্বারা বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। অগ্রদ্বীপের কাজির সঙ্গে গো-হত্যা নিয়ে কালাচাঁদের বিবাদ, সুধীরঞ্জন জগদম্বার কাহিনী, কালাপাহাড়ের শেষ জীবনে মুসলমান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা, সুধীরঞ্জনের বন্দীত্ব ও আত্মপরিচয় ইত্যাদি চিত্রগুলি শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থের প্রভাবজাত।

রসিকচন্দ্র বসুর গ্রন্থকে পূর্ণ উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় না ঔপন্যাসিকের প্রগাঢ় ভক্তিবাদ উপন্যাসের সাধারণ গতি প্রবাহ ও বাস্তবরসের পরিস্ফুটনের বাধাস্বরূপ। 'মতামত' অংশের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় ঃ

'It is difficult to describe exactly the nature of the book ; for it partakes of the character of a novel, a biography and philosophical phamplet written in defence of the popular aspect of Hinduism, which from a misunderstanding of its true spirit is often stigmatised as idolatry.'[১০০]

ঔপন্যাসিকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের প্রতি কালাপাহাড়ের ভ্রান্তধারণা থেকে যে ক্রোধের উদ্ভব তার নিরর্থকতা প্রমাণ এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য জ্ঞাপন। গ্রন্থের আলোচ্য উদ্দেশ্য মুখ্য স্থান অধিকার করার দিকে ঔপন্যাসিক সব সময় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন চরিত্রের প্রাগুক্ত আদর্শের প্রতি, — সেজন্যে তিনি ইতিহাসের মৌল কাহিনীই কেবলমাত্র সংবৃদ্ধি করেছেন — আপন কল্পনার শ্রীবৃদ্ধিতে যত্নবান হননি। গ্রন্থের প্রথমে কালাপাহাড়ের যে ভক্ত ভাব তা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকেছে। ভ্রান্ত কালাপাহাড় আপন ভ্রমের সাহায্যে হিন্দু ধর্মের প্রকৃত আদর্শ উপলব্ধিতে সক্ষম হয়েছেন। কালাপাহাড়ের ধর্মত্যাগ ও হিন্দু-নিধনের ফলে লেখক-মানসে যে অনুশোচনার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই প্রেক্ষাপটে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। কালাপাহাড়ের চরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখানোর ক্ষেত্রে লেখক কল্পনার পরিবর্তে ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন বলে গ্রন্থখানি জীবনীর লক্ষণাক্রান্ত।

কালাচাঁদ ভক্ত প্রেমিক, সমাজের অনুদারতার ফলেই তিনি বিদ্রোহী হয়ে সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিলেন। লেখক গ্রন্থের প্রথমার্ধেই কালাপাহাড়ের ভক্ত মূর্তি অঙ্কিত করেছেন।

'যুবকের পরিধানে কৌষেয় থান, স্কন্দে শুভ্র কৌষেয় উত্তরীয়, দক্ষিণ বাহুতে ইষ্টকবচ, মস্তকে সুবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, ললাট চন্দন-লিপ্ত।'[১০১]

ভক্তিবাদের প্রবক্তা রূপেই বাবাজীর আবির্ভাব। বাবাজী চরিত্র অনেকখানি চৈতন্যের অনুরূপ। নিষ্কাম প্রেমধর্ম প্রচারই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। গুরু-শিষ্যের কথাবার্তায় ভক্তিবাদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে ঃ

'বাবাজী কহিলেন, বাবা জগতের দিকে চাহিয়া আছ কেমন দেখ ?

যুবক (কালাচাঁদ)। বড়ই প্রফুল্ল, সবই যেন আনন্দময়।

বাবাজী, হাঁ বাবা ; জগৎ আনন্দময়, পরমানন্দের আনন্দলীলা-কানন।

উহার আদি, মধ্য, শেষ কেবলই আনন্দ।

যুবক। প্রভু, কিরূপে এই অখণ্ড আনন্দ লাভ হইতে পারে?

বাবাজী। প্রথমে বুঝ, সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ, এসকল মনের অনুভূতি মাত্র। মনকে সহিষ্ণু করিয়া আত্মাবশীভূত করিতে পারিলেই এসকল দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া যায়।'[১০২]

এবং

'যুবক। তবে কি জগতে নিঃস্বার্থ প্রীতি নাই?

বাবাজী। দুর্লভ হইলেও আছে, কিছুই করে না, অথচ দেখিলেই আনন্দ হয়, না দেখিলে জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হয়, সৌভাগ্য ক্রমে এমন বস্তু মিলে। সে মনের মানুষ যখন আসে, তখন প্রীতি আপনি স্ফূরিত হয়। এ প্রেমের পাত্রীপাত্র নাই, জাতিবর্ণ নাই, ইহাতে কামনার কলুষ নাই। এই প্রেমই পরমানন্দ।[১০৩]

'বাবাজী' চরিত্রটি গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'কালাপাহাড়'-নাটকের চিন্তামণি, চরিত্রের অনুরূপ। ক্রোধ ভক্তির অন্তরায়। ক্রোধের ফলেই কালাচাঁদের মোহ জন্মেছিল। পরিশেষে তাঁর মোহমুক্তি ঘটায় তিনি মহানির্বাণ লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ মোহবুদ্ধির স্খালনেই নির্বেদের জন্ম। কালাপাহাড়ের পরিণতি তার সাক্ষ্য।

কেবল কালাপাহাড় নয়, নবাবকন্যা দুলালীও ভক্তিমার্গের অনন্যা সাধিকার বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছেন। তাঁর প্রেম মোহশূন্য — ভক্তিবাদেরই ভিন্নরূপ। শাহজাদী প্রথমে উপন্যাসের রক্ত-মাংসের চরিত্র ছিলেন, পরবর্তীকালে ভক্তিশাস্ত্রের চরিত্রে উন্নীত হয়েছেন। তাঁর পরিণাম 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' গোবিন্দলালের চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। উভয়ক্ষেত্রেই সংসার ধর্ম বিফলতার জন্যে অনৈসর্গিক মনোভাবের সূচনা ও ভগবদভক্তিতে তার বিলয়। বাবাজী এ-কথাই গ্রন্থের শেষাংশে শাহজাদীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

'বাবাজী কহিলেন, এত প্রেম কি মা বিফল হয়; কালাচাঁদ মরিত, তোমার আকর্ষণেই সে জীবিত আছে। আজই তাহাকে পাইবে। কিন্তু মা আর সংসারে থাকিও না, সংসার এ প্রেম-সাধনার ক্ষেত্র নহে।'[১০৪]

বাবাজীর সংসার-অনাসক্তি এবং ঘৃণাত্মক মনোভাবের কারণ অনুধাবন সহজেই সম্ভব। সংসার-বিবিক্ত, প্রেম-প্রীতি-মোহ মুক্ত প্রেম — প্রেম নয়,

ভক্তি মাত্র। ভক্তিমার্গে তা অমূল্য হলেও সংসার ক্ষেত্রে মূল্যহীন। উপন্যাসে এই ভাব শিথিলতা এনে দিয়েছে।

কাহিনী গ্রহণে দুর্গাচন্দ্র সান্যালের 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থের পূর্ণ প্রভাব এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রচলিত কাহিনী বর্ণনা দ্বারা পরিবর্তিত করেছেন মাত্র। রমেশচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মূল ঐতিহাসিক কাহিনীর শ্রীবৃদ্ধির জন্যে যে শাখা-কাহিনী অবলম্বন করতেন আলোচ্য উপন্যাসে সে কৌশল অনুপস্থিত। একমাত্র 'রাণী ব্রজসুন্দরী'তেই উক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। রসিকচন্দ্র নিজের ভাষাভঙ্গীর সাহায্যে মূল কাহিনী পরিস্ফুট করে তুলেছেন। উদাহরণের সাহায্যে উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য প্রমাণ করা যাবে। কালাচাঁদের প্রেমে পড়ার পর তাঁর বংশ-মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে বাদশাহ-তনয়া ও সখীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার সময় দুলারী কৌশলে নায়কের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। সেই অংশটি দুই গ্রন্থে নিম্নরূপ ঃ

'কালাপাহাড়' উপন্যাস ঃ

'মোতিয়া। তুমি বলিলে, অপাত্রে আত্মসমর্পণ কর নাই। পথের মানুষ, অপাত্র কি মুখপাত্র, কি করিয়া জানিলে? দূতী পাঠাইয়াছিলে কি সাজাদী?

দুলালী। দূর বাঁদী চক্ষু মেল্, আরও দেখ্। উহার হাতে কি দেখছিস্?

মোতিয়া। সোনার একটা কি।

দুলালী। সোনার, কোষা। হাতে সোনার কোষা, সঙ্গে ছাতাবরদার, ইহা দেখিয়া কিছু বুঝিলি না?

মোতিয়া। হাঁ সাজাদী, বুঝিলাম ইনি কোন মন্‌সবদার, কি ভূঁইয়া।

দুলালী। গলায় কিছু দেখিতেছিস্?

মোতিয়া। কতকগুলি সূতা। হিন্দুরা ওগুলা গলায় দেয়।

সাজাদী। উনি হিন্দু।

দুলালী। হাঁ, হিন্দু বটে। সব হিন্দুতে ঐ সূতা গলায় দেয় না, যাহারা বড় জাতি — ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, তারাই উহা গলায় দেয়। পৈতা দেখিয়া, মোতিয়া, আমি বুঝিয়াছি, উনি উচ্চজাতি। ঐ যে, উনি কি বলিতেছেন, শুন্‌ছিস্ কি?

মোতিয়া। হাঁ শুনেছি। বেশ ত লাগে।

দুলালী। এমন বেশ কথা যিনি বলিতে পারেন, তিনি যে মূর্খ নন, তাহা বুঝিতে পারিলি? তবেই দেখ, মোতিয়া দূতী না পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা না করিয়াও আমি বুঝিয়াছি, যুবক উচ্চ জাতি, বীর, বিদ্বান ও বিত্তশালী।[১০৫]

উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে নিম্নের অংশ সহজেই তুলনীয় :

'দাসীগণ কহিল, "এই ব্যক্তির কোন পরিচয় না জানিয়া ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা করা অনুচিত।" দুলারী কহিলেন, "পরিচয় আমি যাহা পাইলাম তাহাই যথেষ্ট, উহার গলায় পৈতা দেখিয়া জানিলাম সে নীচ জাতীয় নহে। উহার ছাতাবরদার এবং হাতে সোনার কোষা দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে ধনী লোক, তাহার মন্ত্র পাঠ শুনিয়া আমি বুঝিলাম যে, সে মূর্খ লোক নহে। তাহার শরীর দেখিয়াই জানিলাম যে, সে পরম সুন্দর নব-যুবক। আর বেশী পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।'[১০৬]

অপর একটি অংশ উদ্ধৃত করে কাহিনীর সামঞ্জস্য প্রমাণ করা যেতে পারে।

'বাদশাহ। দুলালী বিবাহের যোগ্যা হইয়াছে। তাহার বিবাহের জন্য একটি সুপাত্রের আবশ্যক। আমি তোমাকেই দুলালীর বর মনোনীত করিয়াছি।'[১০৭]

কালাচাঁদ। হুজুর, গরীব সাজাদীর পানিগ্রহণের উপযুক্ত নহে। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ।[১০৮]

বাদশাহের চোখ রক্তবর্ণ হইল। গম্ভীরভাবে কহিলেন, কালাচাঁদ! আমি কে জান?

বাদশাহের ললাটের শিরা স্থূল হইয়া উঠিল। বিকৃত স্বরে ডাকিলেন মুজাফর।

বাদশাহ কহিলেন এই বদ্‌বখ্‌তকে বন্দী কর। কাল ইহার শূল হইবে।[১০৯]

রাত্রির মধ্যেই নগরে প্রচারিত হইল, কল্য প্রাতঃকালে ফৌজদার কালাচাঁদ রায়ের শূল হইবে।[১১০]

এমন সময় মোতিয়া আসিয়া সংবাদ দিল কারাগৃহের নিকট গোলমাল শুনা যাইতেছে, বুঝি তাঁহাকে লইয়া যায়।

দুলারী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।[১১১]

প্রহরী-বেষ্টিত বদ্ধহস্ত কালাচাঁদ অধোমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়ে সকলে দেখিল, বিদ্যুল্লতার ন্যায় আলুলায়িত কুন্তলা এক তরুণী উন্মাদিনীর মত সেই দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে।...

তরুণী উন্মাদিনীর মত বন্দীর দিকে আসিতে লাগিলেন।...

উন্মাদিনী, কাতরকণ্ঠে "প্রভু, য্যামিন" বলিতে বলিতে বন্দীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

কালাচাঁদের হাতের বন্ধন খুলিয়া গেল, হৃদয় উথলিয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। প্রেমের নিকট লজ্জা, মান, ভয়, এই তিন পরাজিত হইল। অজ্ঞাতসারে কালা চাঁদের মুক্তহস্ত তরুণীকে আলিঙ্গন করিল।'[১১২]

প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুইটির কাতর দৃষ্টিতে প্রাণের অনন্ত বেদনা জানাইয়া উন্মাদিনী কহিল, স্বামিন্, দাসীর প্রাণ থাকিতে এই বাহুবন্ধন হইতে কেহ তোমাকে নিতে পারিবে না, আমি প্রাণ দিয়া তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিব। আগে দাসীর প্রাণ যাউক।....

কারাধ্যক্ষ হোসেন খাঁ ফাঁফরে পড়িলেন। এই অভাবনীয় ঘটনা তাহাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিল। কিছুকাল বিস্ময়বিমুগ্ধের ন্যায় রহিয়া, তিনি বাদশাহের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।[১১৩]

ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে কালাচাঁদ কহিলেন, শাহেনশা, আমি শাহজাদীকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি।'[১১৪]

উপরোক্ত বিস্তৃত অংশের সঙ্গে সান্যাল-কৃত গ্রন্থের অংশ-বিশেষ মিলিয়ে পড়লেই রসিকচন্দ্রের কাহিনী-উৎস সম্পর্কে সহজেই অবহিত হওয়া যায়।

'পরদিন কালাচাঁদকে আটক করিয়া বাদশাহ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, কালাচাঁদ তাহা স্বীকার করিলেন না। সম্রাট নানা প্রকার লোভ ও ভয় প্রদর্শন করিয়াও কালাচাঁদকে সম্মত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ শূলে দিতে আদেশ দিলেন। জল্লাদেরা কালাচাঁদকে বন্দী করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। মুহূর্ত মধ্যে সেই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচার হইল। দুলারী সেই সংবাদে উন্মত্তার ন্যায় খিড়কী দার দিয়া রাজবাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া কালাচাঁদকে জড়াইয়া ধরিলেন। এবং ঘাতকদিগকে বলিলেন, আমাকে হত্যা না করিয়া কেহ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।" জল্লাদেরা হতবুদ্ধি হইয়া বাদশাহের নিকট সংবাদ দিল। বাদশাহ কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে দুলালীর নিকট চলিলেন। এদিকে কালাচাঁদ সেই সম্রাট কুমারীর অদ্ভুত প্রেম, তাঁহার

সৌন্দর্য ও নবযৌবন দৃষ্টে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।'[১১৫]

কালাপাহাড় উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে ঔপন্যাসিক এখানে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কাহিনী চিত্রিত করেছেন। এই কারণেই কালাপাহাড় প্রচণ্ড ধর্ম-বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও পাঠক মনে কোন সময়ে তাঁর অত্যাচারী মূর্তি বিরূপতার সৃষ্টি করেনি। গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে জনৈক অধ্যাপক মন্তব্য করেছেন ;

'It must be said that it is no small credit of the author that the hero of this book, inspite of his econoclasm, does never lose the sympathy of the Hindu readers'[১১৬]

কালাপাহাড়ের চরিত্র ধর্মীয়-আবরণ দিয়ে আবৃত করলেও লেখক স্বকীয় প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হননি, বলা বাহুল্য, এই অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গিটি সহজেই যুগদুর্লভ গুণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাণী ব্রজসুন্দরী' উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা অপেক্ষাকৃত কম। কালাপাহাড় সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনীকে উপন্যাসের প্রয়োজনে তিনি তিন পর্বে বিন্যস্ত করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে ঐতিহাসিক উপাদান সবচেয়ে বেশী — কাহিনীর প্রয়োজনানুসারে উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম অংশে ঐতিহাসিক উপাদান সর্বাপেক্ষা কম এবং তৃতীয় পর্বে স্বল্পতর।

সমকালীন লেখকদের হাতে কালাপাহাড় কেন্দ্রিক কাহিনী প্রয়োজনের প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন রূপ পেয়েছিল। তাঁর স্বধর্ম-ত্যাগ ও স্বজাতি ধ্বংসের কাহিনী কেউই প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করেন নি। তিনি যে স্বধর্মের মাহাত্ম্য অনুভব করতে না পেরে অন্যধর্ম গ্রহণ করেছিলেন একথা প্রতি উপন্যাসেই প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায়। তার ফলে উপন্যাসগুলিতে হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব প্রচার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। শচীশচন্দ্রের উগ্র দেশাত্মবোধ কালাপাহাড় কেন্দ্রিক কাহিনী রচনায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করেছিল। তিনি ইতিহাস-পরিচিত চরিত্রকে নায়ক না করে ইতিহাসে অপ্রধান চরিত্র ব্রজবালাকে

কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য চরিত্রও ব্রজবালার ভাবাদর্শ প্রচারের সহায়ক হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে। সে জন্যে কালাপাহাড় উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নন, — সে-মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁর পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী ব্রজবালা, যিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদ সংরক্ষণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সঙ্গে। তাঁর আচরণের ওপর কাহিনীর গতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এবং শেষ পর্বের ঘটনা তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। উড়িষ্যায় কালাপাহাড়ের সসৈন্যে উপস্থিতি ছাড়া তাঁর আর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই — সেখানে তিনি উপেক্ষিত। ব্রজবালা তখন রাণী ব্রজসুন্দরীতে রূপান্তরিত এবং উড়িষ্যার রাজার আশ্রয়ে থাকার পর তাঁরই নির্দেশে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। এই কাহিনী একান্তভাবে অনৈতিহাসিক। ঔপন্যাসিক কল্পনার সাহায্যে ইতিহাস উপেক্ষিত ব্রজবালাকে মূল কাহিনীর কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রচলিত কিংবদন্তীতে কালাপাহাড়ের দ্বৈত স্ত্রী সম্পর্কে বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। ঔপন্যাসিক মন এই নিষ্ক্রিয়তার একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করেছিল, সেই ব্যাখ্যার পরিণতি হিসাবে ব্রজবালা হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শ রূপে উপন্যাসে স্থান পেয়েছেন। লেখক আবিষ্কৃত নতুন ব্যাখ্যাই উপন্যাসের মূল ঘটনা এবং ঔপন্যাসিক এদিক থেকে ইতিহাসকে উপন্যাসের প্রয়োজনে কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকেই শচীশচন্দ্র কাহিনী-নির্মাণের এই জটিলতা আয়ত্ত করেছিলেন।

ঐতিহাসিক উপাদানের দিক থেকে বিচার করলে 'রাণী ব্রজসুন্দরী'-কে অর্ধ-ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। সেজন্যে কাহিনী অপেক্ষাকৃত মিশ্র শ্রেণীর এবং ইতিহাস অনেকক্ষেত্রে কল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তর শচীশ-মানসে একান্তই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতই দেশ ও জাতিপ্রেম তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল এবং অর্ধ ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে উপরোক্ত ভাব প্রকাশিত হয়েছে বৃহত্তর পটভূমিকায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের যে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে সেদিকে তিনি সব সময় দৃষ্টি দেননি।[১১৭]

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে বাঙলা উপন্যাসের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্কটের ইতিহাসে সাধারণ ব্যক্তিরাই অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রধান চরিত্রের স্থান অধিকার করেছে। এর কারণ ঔপন্যাসিক অতি মাত্রায় ইতিহাস

সচেতন ছিলেন। এই সচেতনতার জন্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ নায়কের চরিত্র উপন্যাসে রূপান্তরিত করতে পারেন নি। উপন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলি বিচিত্র-কল্পনায় উদ্ভাসিত হত। লেখক নিজের আদর্শবাদের সঙ্গে কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রিত করতেন — বাস্তব ও অবাস্তবের চমৎকার সমন্বয় হত, সমালোচকরাও ত্রুটির জন্য অনুশোচনা করতেন না।

পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকদের তুলনায় বাঙালী ঔপন্যাসিকরা ইতিহাস-সচেতন ছিলেন না বলে, তাঁদের হাতে ঐতিহাসিক চরিত্র বিভিন্ন রূপ পেত তাঁদের কল্পনায়। ঐতিহাসিক বিকৃতির প্রতি তাঁরা লক্ষ্য করতেন না। উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সঙ্গে ব্রজসুন্দরীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলেই উপরোক্ত ত্রুটি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। লেখক উভয় চরিত্র স্বকীয় আদর্শানুযায়ী অঙ্কিত করার সময় ইতিহাসের মর্যাদা কতখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ইতিহাসের সত্যের চেয়ে তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে আদর্শের সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও এই ত্রুটি স্পষ্ট। তিনি অবিখ্যাত সন্ন্যাস-বিদ্রোহের পটভূমিকায় নিজের আদর্শ প্রচার করেছেন বিস্তৃত আকারে — ফলে ঐতিহাসিক সত্যতার চেয়ে অবাস্তবতাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। শচীশচন্দ্র দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে কালাপাহাড়-দুলারীর কাহিনীর পরিবর্তে রচনা করেছেন মুকুন্দরাম-ব্রজসুন্দরীর কাহিনী। দুলারী-কাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন, কালাপাহাড় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেছেন এবং ইতিহাস-অজ্ঞাত চরিত্র উপন্যাসে প্রধান চরিত্ররূপে বিচরণ করেছেন।

রাণী ব্রজসুন্দরী তিন পর্বে পরিকল্পিত কাহিনী হলেও পারিপার্শ্বিক চরিত্র দ্বারা আরও মিশ্র আকার ধারণ করেছে। সাঁতোড়রাজ গদাধর, কালাপাহাড়ের অন্যতমা স্ত্রী রাজবালা (উপন্যাসে ছদ্মনাম বুনা), নটবর, ললাটী, করিম শা চরিত্র এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শাখা-কাহিনী মূল কাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একক গতিধারা সৃষ্টি করেছে।

ব্রজবালা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। অনুপম রূপ ও অপরিসীম দাম্ভিকতা তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যকে সে নিজের প্রতি প্রলোভিত করেছে এবং পরিণামে দাম্ভিকতা তাদের পূর্ণ মিলনে বাধা সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ রমণী হয়

'ফেথফুল', নয় 'বিউটিফুল.' এক সঙ্গে দুটো নয়। রূপশ্রী ও মদন—অনুচর শ্রীবৃদ্ধির ফলে ব্রজবালার মধ্যে নৈতিকতা-বিরোধী মন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। তার জন্যেই তিনি কালাপাহাড়ের কাছে সুখী হননি। গদাধর রূপমোহে আকৃষ্ট হয়ে উড়িষ্যা পর্যন্ত ছুটে গিয়েছে; উড়িষ্যাধিপতি ভীরু জন্তুর মত তাকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে আবর্তিত হয়েছেন। প্রথম পর্বে ব্রজবালা চরিত্রে দ্বৈতরূপ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিবাহ-প্রসঙ্গে কালাচাঁদ ও গদাধরের মধ্যে কথোপকথন এবং পরবর্তী-কালের আচরণ তার প্রমাণ।

> 'কালা। কালাচাঁদ জীবনে আজও মিথ্যা বলেনা। শুন তবে গদাধর, আজিকার কথা নয় — এক বৎসর হইতে আমি ব্রজবালাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি, এক বৎসর হইতে ব্রজবালাও আমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছে, উভয়ে উভয়েরই নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
>
> গদা। আমিত ওই রকম একটা কথা বলিতে পারি।'[১১৮]

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ব্রজবালা একই সঙ্গে উভয়ের অসাক্ষাতে উভয়ের প্রতি প্রেম নিবেদন করেছেন, 'ক্রোধী, গর্বিতা, মুখরা, উদ্ধতা, আত্মসুখপরায়ণা, নির্মম, হৃদয়হীনা, আত্মাভিমানিনী, লজ্জাসঙ্কোচপরিশূন্যা'[১১৯] কালাচাঁদের সঙ্গে বিয়ের পর তিনি 'অলঙ্কার' ও 'অর্থ' নিয়ে গৃহত্যাগ করেছেন। এই অংশে তাঁর চরিত্র আরও স্পষ্ট। 'দিল্লীশ্বরের ইপ্সিত' রূপ তিনি দুজনের কাছে তুলে ধরেছিলেন। একজনের কাছে বদ্ধ হওয়ার পর মুহূর্তে অন্য জনের কাছে পুনরায় নিবেদন। গদাধরের কাছে লিখিত চিঠি তার প্রমাণ:

> 'যতদিন না তস্কর কর্তৃক রত্ন অপহৃত হয়, ততদিন কি নিশ্চেষ্ট ও নীরব থাকিবে? আমি যে তোমারই প্রতীক্ষায় দেহ-মন লইয়া বসিয়া আছি, গদাধর!'[১২০]

গদাধরের প্রতি উগ্র আসক্তি সত্ত্বেও স্ব-ইচ্ছায় কালাচাঁদকে বরণ করেছেন। আবার কালাচাঁদের গৃহত্যাগ করে পূর্ব প্রণয়ী গদাধরের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

গদাধর-ব্রজবালা সম্পর্কিত অংশে লেখক গদাধরের একনিষ্ঠ প্রেম ও ব্রজবালার দ্বৈতাচরণ দেখিয়েছেন। গদাধর চরিত্রের বলিষ্ঠতা, নির্ভীকতা, নীরবতা

ব্রজবালাকে মুগ্ধ করে ছিল। ব্রজবালা গৃহত্যাগের পর গদাধরের প্রকৃত মনোভাব উপলব্ধি করা করা যায়।

> 'গদাধর। কেন গৃহ ত্যাগ করলে ব্রজবালা, গৃহ যে মন্দির!
> ব্রজ। কেন গৃহত্যাগ করলুম, শুনবে? কেন মাতা-পিতা, স্বামী, আত্মীয়স্বজন, লজ্জা, ধর্ম, কুল, মান ত্যাগ করলুম, শুনতে চাও; কুমার আমি তোমার —'

পরবর্তী অংশে

> তুমিও আমায় ঘৃণাভরে উপেক্ষা করলে; বেশ। কিন্তু স্মরণ রাখিও, গদাধর, আমি পাপ করে থাকি, সে তোমার জন্য — অধর্মাচরণ করে থাকি, সেও তোমার জন্য।[১২১]

অতি-নৈতিকতার অধিকারী গদাধর প্রেম প্রতিযোগিতায় কালাপাহাড়ের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি — নৈতিকতা তাকে অনেক খানি ভীরু করে গড়ে তুলেছিল।

ব্রজবালার চরিত্রের দ্বৈধতার জন্যেই রাজা মুকন্দরায় তাকে জয় করতে পেরেছিলেন, শৈশবে ব্রজবালা কালাচাঁদ ও গদাধর উভয়কে ভালবাসলেও গদাধরের রাজসিক গুণের জন্যে তাকে অপেক্ষাকৃত বেশী কামনা করতেন। কালাচাঁদকে পতিরূপে গ্রহণ তাঁর জটিল চরিত্রের এক অভিনব আচরণের স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীকালে রাজা মুকুন্দরামের সঙ্গে তার আচরণ স্বৈরিনীরই নামান্তর মাত্র। রাজাকে প্রার্থকে স্বীকারও করেননি, অস্বীকারও করেননি। তার এই মনোভাবের প্রশ্রয় পেয়ে রাজা ধীরে ধীরে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছেন। মুকুন্দরামের দেহজ ভালবাসার মধ্যে তাঁরও নবজন্ম হয়েছে। ব্রজবালা রূপজ মোহকেই প্রধান বলে জানতেন। কিন্তু রাজার কাছ থেকে প্রেমের মহত্তম আচরণ শিক্ষালাভ করেছেন। নারী কামুক, মুকুন্দরাম তাঁকে প্রেমের মহোচ্চলোকে উন্নীত করেছেন।

উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দরায়-উপন্যাসে কামুকতার প্রতিনিধিরূপে চিত্রিত। উপন্যাসের এক অংশে লেখক মন্তব্য করেছেন, 'তিনি বিলাসী ও রমণী অভিলাষী ছিলেন।[১২২] এই মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই তাঁর চরিত্র চিত্রিত ও ব্রজবালার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বৃহৎ করে দেখান হয়েছে। প্রথমে তিনি লালসার মধ্যেই

প্রেমের চরম বিকাশ অনুভব করেছেন। গ্রীক মিথোলজিতে দেখা যায়, প্রেমদেবী আফ্রোদিতির দু'রূপ — একটি কামনারঞ্জিত, অপরটি কামনা-বহির্ভূত মূর্তি। ইউরানিয়ান হলেন কামনাবহির্ভূত প্রেমের প্রতিমূর্তি ও প্যাণ্ডেমাস ইন্দ্রিয়ভূত প্রেমের প্রতীক।[১২৩] মুকুন্দরাম ব্রজবালার সংস্পর্শে এসে অপ্রাপনীয় প্রেমের মাধুর্যের মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃত রূপ-বৈশিষ্ট্য অনুভব করেছেন। তাঁর আচরণে একটি চেতনাসম্পন্ন শরীরী মানুষ প্রতিফলিত হয়েছে। ব্রজবালার কাছে তাঁর চিঠি:

> 'রাজা। তুমি যে দেশে আসিয়াছ সে দেশে বিশ্বাস বলে কোন পদার্থ নেই। রাজ্যলোভে পুত্র পিতাকে, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা করে। কোনও কর্মচারী হয়ত মহিষীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে বিষ খাওয়াইতে পারে, পুত্র হয়ত কালাপাহাড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিতে পারে। আমি বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে পারি এমন কোনও ব্যক্তি সংসারে আমার নাই। আমি সকলকে ভালবাসিতে চাই, কিন্তু কেহ আমাকে ভালবাসে না। আমি স্নেহ নিয়ে যাই, তারা স্বার্থ নিয়ে আসে।'[১২৪]

উদ্ধত স্বভাব সত্ত্বেও কালাচাঁদ সহজ জীবনের প্রত্যাশায় ব্রজবালা অভিমুখী হয়েছিলেন। তাঁর নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উপহাস করেছে। শৈশবে তাঁর মনোবাঞ্ছা ছিল বাঙলাদেশ থেকে মুসলিম বিতাড়ন করে হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, অথচ দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি ভবিষ্যতে বিপরীত পথে চালিত করে দুই জীবনের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিরাট পার্থক্য-রেখা। দুই প্রান্তবর্তী জীবনের উক্তির মধ্যে এই মনোভাবের পরিচয় মুদ্রিত।

প্রথম জীবনের স্বপ্ন:

প্রথম জীবনের স্বপ্ন:

> 'কালাচাঁদ বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল দেখি ঠাকুর, আমি কখন বাঙ্গালা হ'তে মুসলমান তাড়াতে পারব কিনা?"[১২৫]

উত্তরকালে স্বপ্নভঙ্গ:

> 'কালা। বেশ, আজ হতে তবে আমি হিন্দু নই, আমি ম্লেচ্ছ, কাদের, আমি মুসলমান। যে যজ্ঞোপবতীত আমি ধর্ম, অগ্নি, নারায়ণের সমক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আজ ত্যাগ করিলাম।'[১২৬]

ব্রজবালার প্রতি কালাচাঁদের ভালবাসার অভাব ছিল না — অন্তরায় ছিল তাঁর উদ্ধত স্বভাব ও রূপগর্ব। অবশ্য লেখক কালাচাঁদের চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র দুর্বলভাবে অঙ্কিত করেছেন ভার সাম্যের অভাবে। একটি অংশ উদ্ধৃত করলে এ-বিষয় স্পষ্ট হবে।

নবাব-কন্যা দুলারী কালাচাঁদকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। পূজোর জন্যে কালাচাঁদের ফুলের প্রয়োজন ছিল বলে তিনি নিজের বাগান তার জন্যে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। উপন্যাসে উদ্যান-মধ্যে একটি দৃশ্যে শব্দ-ব্যবহারের অসতর্কতার জন্যে তাঁকে দুর্বলভাবে অঙ্কিত করে ফেলেছেন। সেই অংশটি নিম্নরূপ ঃ

> 'ফৌজদার দাঁড়াইলেন, চারিদিক পানে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তখন আবার অগ্রসর হইলেন। পিছনে আবার কে কি বলিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, লতাকুঞ্জের দ্বারপথে সেই ভুবনমোহিনী কিশোরী দণ্ডায়মান। কালাচাঁদ বুঝিলেন, এ রমণী সুলতান তনয়া।'
>
> জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার আদেশ কি নবাব-পুত্রী ?'
>
> 'আপনি আমায় কিরূপে চিনিলেন ফৌজদার সাহেব ?
>
> 'অনুমানে বুঝেছি।'
>
> 'আমার রূপ দেখে ?'
>
> 'আপনার যে রূপ আছে, তাহা আমি লক্ষ্য করিনি।'[১২৭]

শব্দ-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলেই লেখকের অসতর্কতার পরিচয় পাওয়া যাবে। নবাবকন্যাকে সামনে দেখে 'ভুবনমোহিনী' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করলেও পরক্ষণে বলেছেন তিনি তাঁর 'রূপ' দেখেননি। অথচ 'রূপের আগে' ভুবনমোহিনী, বিশেষণ এবং সেই শব্দ প্রয়োগে বোঝা যায় তিনি পূর্বেও তাঁর অসামান্য লাবণ্য দর্শন করেছিলেন।

দুলারী চরিত্র অন্যান্য চরিত্রের মত পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। দ্বিতীয় পর্ব ছাড়া অন্য দু' পর্বে তিনি উপেক্ষিতা। কালাচাঁদের জীবনে তিনি যে পরিবর্তন এনে-ছিলেন উপন্যাসে তার কোন পরিচয় নেই। তার ফলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র পরিস্ফুট হওয়ার কোন অবকাশ পায়নি অনৈতিহাসিক চরিত্রের কার্যকর্মই প্রধান হয়ে উঠেছে।

শচীশচন্দ্রের উপন্যাস মূলত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ কেন্দ্র করে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস সম-প্রকৃতির হলেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। উভয়ের জীবন অনুধ্যান অন্য প্রকৃতির হওয়ায় সাহিত্যেও ভিন্নরীতি অনুসৃত হয়েছে। শচীশচন্দ্র হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-চিত্র উপন্যাসে তুলে ধরেছেন এবং এই সম্পর্কের চিত্রাঙ্কনই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্বজাতি পক্ষপাত ঘটেছে। লেখক সব ক্ষেত্রেই স্বজাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে অন্য জাতির দোষ, ত্রুটি, অত্যাচার তাঁর দৃষ্টিতে বৃহত্তর আকারে প্রতিভাত হয়েছে। তার কোন কোন উপন্যাসে এই দৃষ্টিভঙ্গী অতিশয় প্রকট।[১২৮]

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাগুক্ত-রীতির দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে ইতিহাসের মূল ঘটনা অবলম্বনে রচিত কাহিনীর রোমান্স-প্রিয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক কালে মানবজীবনের গতিধারা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম প্রভৃতির ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্জীবনের সংঘাত চিত্রিত করেছিলেন। সীতারামের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী মুসলমানদের হাত থেকে নিরীহ হিন্দু-প্রজাদের রক্ষা করা। কিন্তু তাঁর জীবনে রূপজ মোহ প্রধান হয়ে মহৎ কামনা ধূলিসাৎ করে দিল। মুসলমান কর্তৃক রাজ্য-বিতাড়িত হেমচন্দ্র নিজের জীবনের ব্রত বিস্মৃত হয়ে মৃণালিনীর প্রেমানুধ্যানে অধিক সময় অতিবাহিত করেছেন। শচীশচন্দ্রের দৃষ্টি বঙ্কিম-বিপরীত হওয়ায় তাঁর উপন্যাস অনেকখানি সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার-পত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

| পরিশিষ্ট |

কালাপাহাড় কেন্দ্রিক সমকালীন নাটক :

(ক) কালাপাহাড়, হরিশ্চন্দ্র হালদার,
প্রকাশকাল : কলিকাতা ১৮৮১, পৃষ্ঠা ১১৬

(খ) কালাপাহাড়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ,
প্রকাশকাল : কলিকাতা ১৮৯৬, পৃষ্ঠা ২০৪

(গ) ধর্ম-বিপ্লব, মনোমোহন গোস্বামী,
প্রকাশকাল : কলিকাতা ১৯১৩,

(ঘ) কালাপাহাড়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়,
প্রকাশকাল ১২৯ ১৯৩০ (চতুর্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা ১৯২

কালাপাহাড় কেন্দ্রিক উপন্যাসের মত নাট্যকারেরা নাটককেও গ্রহণ করেছিলেন সমকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে। উপন্যাসের সঙ্গে উদ্দেশ্যগত ক্ষেত্রে এখানে নাটকের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। সমকালীন নাটকের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'কালাপাহাড়' নাটক। তার কারণ, অন্যান্য নাট্যকারের মত তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, দ্বিতীয় রামকৃষ্ণের সংসর্গে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি বিধর্মী কালাপাহাড়কে ভক্তিবাদের দ্বারা অনেকখানি আবৃত করে নিয়েছিলেন বলে নাটকে অভক্ত কালাপাহাড় রূপান্তরিত হয়েছেন পরম ভক্ত রূপে।

হরিশ্চন্দ্র হালদার তাঁর 'কালাপাহাড়' বা 'ধর্মদ্রোহী' নাটক যুগ-প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। সেজন্যে, নাটকে কতকগুলি প্রধান দিকের পরিবর্তন সাধন করা হয়। কালাপাহাড় সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী নাট্যকারের জাতীয় ভাবনা প্রকাশের অনুকূল না হওয়ায় তিনি কাহিনী ও চরিত্র হিন্দু-আদর্শ বিকাশের দিক থেকে নিজের মনোমত করে গড়ে নিয়েছিলেন। সংস্কার সাধনের ফলে কাহিনী ও চরিত্র দুইই পরিবর্তিত হয়েছে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নাম ও স্থান তুলে দিলে পাঠকের পক্ষে বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

সমসাময়িক উপন্যাস ও নাটকে কালাপাহাড় যে-ভাবে চিত্রিত হয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রের নায়ক তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি অতি দুর্বল অথচ তীব্র জৈবিক-কামনাযুক্ত ব্যক্তি। এ-প্রসঙ্গে একটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, হরিশ্চন্দ্রের নাটক হচ্ছে কালাপাহাড় সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ। তাঁর সামনে বিশেষ কোন আদর্শ না থাকায় উদ্দেশ্য হিসাবে কাহিনীর পরিকল্পনা করতে হয়েছিল। সেজন্যে তিনি নিজের মনোমত কাহিনী নির্মাণের স্বাধীনতা পেয়েছিলেন। কালা-পাহাড়-চরিত্র তার অন্যতম প্রমাণ। নায়ক চরিত্রে যে-পরিমাণে তেজস্বিতা থাকা প্রয়োজন তার অণুমাত্র কালাপাহাড়ের ধর্ম মধ্যে নেই। নাট্যকার কালাপাহাড়ের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন। তার প্রমাণপাওয়া যায় 'উপহার' পৃষ্ঠায় তাঁর প্রতি বিশেষণ ব্যবহারে। নাটক উৎসর্গ করে তিনি লিখেছেন ঃ

> 'আমার এই হিন্দু-ধর্মবিদ্রোহী, নিষ্ঠুর, পাষণ্ড, বিধর্মী, যবন, কালাপাহাড়কে আপনার পবিত্র কর-কমলে অতি সন্তর্পণে অর্পণ করিলাম ; '

শাহজাদীর রূপলাবণ্য কালাপাহাড়কে মোহাবিষ্ট করেছিল। সেই রূপতৃষ্ণার কাছে তিনি ধর্ম, বিবেক, শূরত্ব সমস্তবিসর্জন দিয়ে তাঁকে কামনা করিতেছিলেন ;

> 'কালাদাস' (স্বগত)। সংসার কদিন। এখানে সমস্তই লীলাখেলা বইত নয়। যদি মরে গেলুম তবে ত সবই ফুরিয়ে গেল। আর যতদিন জগতে বেঁচে থাকব, ততদিন প্রাণের সাধ কেন না মেটাব ?[১৩০]
>
> 'সামান্য জঘন্য হিন্দু-সমাজের অনুরোধে এমন সুখের স্বর্গ-রাজ্যটা পা দিয়ে ঠেলব ? না, তা হতে পারে না। প্রেম ! তুমিই জগতে সত্য।' [১৩১]
>
> 'মতিয়া। তুমি কি আমার ? আমি তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। যেদিন থেকে তোমার সুবিমল মুখখানি দেখেছি, সেইদিন অবধি মন, প্রাণ তোমাতেই অর্পণ করেছি। ... মতিয়া, মুসলমান ধর্মে-দীক্ষিত হব, এত সামান্য কথা। ... তাইত—সন্ধ্যাটা যে গড়িয়ে গেল ! গায়ত্রীটা উচ্চারণ করে নিই না কেন ?' [১৩২]
>
> 'মুরতিয়া, আমি এই প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আর কখন গায়ত্রী উচ্চারণ করব না। ওটা হঠাৎ কেমন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ছিল, তাতে অত রাগ কেন ?' [১৩৩]

'মুরতিয়া। কেন, তুমি দাড়ী রাখ, আমাদের মতন ইজের আলখাল্লা পর, নামাজ কর, তাহলে আমাদের বিবিজান নিশ্চয়ই তোমার প্রেমে আবদ্ধ হবেন, প্রকৃত যবন হও, যবনের কার্য কর।

কালা। ... তুমি রাজকুমারীর সখি, তুমি যা বলবে, আমি তাতেই প্রস্তুত, আর আমি পাপিষ্ঠ হিন্দুদের কথা কখনই শুনব না। আমি নিশ্চয়ই ত্রি-সন্ধ্যা নামাজ করব ; হিন্দুর বেশ, হিন্দুর আচার, হিন্দুর ব্যবহার, সমস্তই অন্তর্হিত করব।' ১৩৪

কালাপাহাড়ের মত নাট্যকারের হাতে শাহাজাদী মতিয়া-চরিত্রও সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়েছেন। কালাপাহাড় সম্পর্কিত উপন্যাসে অথবা অন্যান্য নাটকে নায়িকা তাঁর প্রেমের মর্যাদার জন্যে বিশেষ গুণে ভূষিতা হয়ে চিত্রিত হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্র চরিত্রাঙ্কনের পরিবর্তে উদ্দেশ্য সাধনের দিকে বেশী লক্ষ্য দিয়েছিলেন বলে মূল চরিত্রগুলি বিকৃত—ইতিহাস বিচ্যুত কৃত্রিম চরিত্র। নাটকে দেখা যায় কালা-পাহাড়ের প্রতি তাঁর প্রেম-তীব্রতা নেই — হিন্দুকে মুসলমান রমণীর প্রেমে আবদ্ধ করার জন্যে কুহক-জাল রচনা করেছেন। প্রাণের গভীর আবেগে তাঁর প্রেম উৎসারিত নয়। শাহজাদী ও তাঁর সখী মুরতিয়ার মধ্যে কথোপকথনকালে এই কৃত্রিম ভাব প্রকাশিত।

'মতিয়া। আচ্ছা সখি কালাপাহাড়১৩৫ শীঘ্র কি আমাদের কুহক জালে পড়বে ?

মুর। রাজকুমারী তাকি আর বলতে ? যে ফাঁদ পেতে এসেছি তাতে নিশ্চয়ই কাম বজায় হবে।১৩৬

'মতি। .... মনে করেছিলাম যে হিদুঁরা যবনের সঙ্গে বিয়ে করবে না। তা কালাপাহাড় ! মনে করেছ যে, গোপনে প্রেম করবে ? আমাদের কাছে খোলাখুলি। আজ এলে হয়, আমি যে ভালবাসি আজ সে ভালবাসার জন্য তোমায় আমায় একসঙ্গে খানা খাব ; তোমায় আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়াবো।'১৩৭

প্রেম সম্পর্কে শাহজাদীর শর্ত ঃ

মতি। আমার প্রতিজ্ঞা যিনি হিন্দুদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, এমন কি হিন্দুদের ধর্মের বিপক্ষে যিনি বিরোধী হবেন, তাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করব।১৩৮

মতিয়া চরিত্রে অতি-সাম্প্রদায়িকভাব নাট্যকারের আরোপিত। মতিয়া চরিত্রে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। যিনি প্রথমার্ধে এমন উগ্র সাম্প্রদায়িক ছিলেন, জীবনের শেষ প্রহরে তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের কোন কারণ নাট্যকার নির্দেশ করেননি। অথচ এই চরিত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্র — কালাপাহাড়, সোলেমান, সরলার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। নাট্যকার মতিয়া চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে পারেননি বলে মূল কাহিনীও অস্ফুট থেকে গেছে।

কালাপাহাড় ও মতিয়ার আচরণ নাটকে গৌণ বস্তু — প্রকৃত বিষয় হল বিভিন্ন চরিত্রের সহায়তায় স্বদেশপ্রেম, হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ। নাট্যকারের আবেগ এই শ্রেণীর শাখা-চরিত্রগুলির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত। সমকালীন রাজনৈতিক ভাবনা দ্বারা চরিত্রগুলি উদ্বোধিত বলে নাট্যকার স্বতন্ত্রভাবে তাদের কাজে লাগিয়েছেন। কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণে উদ্যত হলে ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে নাট্যকার স্বদেশাত্মক বাণী প্রচার করেছেন ঃ

> 'ব্রাহ্মণ। ভারতবাসী! উঠ? ধর্ম লোপ — বংশলোপ — আর নীরবে থেকো না, পামর কালাপাহাড় ধর্মলোপ করে। উঠ? জাগ? দুরাত্মার মস্তক ছেদন কর। ...
>
> ভারতবাসী জাগ—উঠ — ধর্মলোপ, বংশলোপ — দুরাত্মা কালাপাহাড় — যবন কোথায়? ধর—ধর—ভারতবাসী—ধর— [১৩৯]

ব্রাহ্মণ্যধর্মের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে কালাপাহাড়ের পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী সরলার মাধ্যমে। সরলা হিন্দুধর্মের পবিত্রতার প্রতীক — হিন্দুধর্মের আচার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

> সরলা। একটা সামান্য মায়া কুহকিনীর কাছে এমন পবিত্র পৃথিবী পূজিত ব্রাহ্মণ্যধর্মে কলঙ্ক অর্পণ করলে? [১৪০]
>
> (বেগে খড়্গহস্তে যবনবেশে কালাপাহাড়ের প্রবেশ)
>
> কালা। এখনও বলছি যবন ধর্মে দীক্ষিত হ। ... নচেৎ তুই নিশ্চিৎ জানিস যে, এই করাল কৃতান্ত যম কালাপাহাড় স্ত্রীবধ কর্তেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। [১৪১]
>
> সরলা। ইটি বেশ জানবেন যে, হিন্দুললনা যবনী হয়ে কখন যবন কন্যার পদ সেবার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। [১৪২]

পরবর্তী অংশে ঃ

> সরলা। পিতঃ! সরলার হৃদয়ের শোণিত দিয়ে যদি এই ত্রিলোক পূজিত হিন্দুধর্ম রক্ষা হয়, তাতে সরলা এখনি প্রস্তুত আছে। একটা ক্ষুদ্র ললনার হৃদয় শোণিত উৎসর্গ করে যদি হিন্দু সমাজের দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন হয় তবে কেন উপেক্ষা কচ্চেন? পিতঃ! তোমার চরণ ধরে বলছি তোমার এ হতভাগিনী কন্যাকে জনমের মত বিদায় দাও।[১৪৩]

সরলার উক্তি তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজের মন্তব্য।

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদ-আন্দোলন মুখ্যত পরিচালিত হয়েছিল হিন্দুত্ব সংরক্ষণের জন্য। সেখানে মুসলমানের স্থান ছিল না। হিন্দুরা মুসলমানদের বিদেশী বলেই মনে করতেন। এ-যুগের প্রথম জাতীয়তাবাদ প্রচারমূলক ভাব সক্রিয় হয়ে উঠে 'হিন্দু-মেলা' প্রতিষ্ঠায়। হিন্দু-মেলা প্রচলিত হয় ভারতে অখণ্ড হিন্দু-সংস্কৃতি সংরক্ষণার্থে ঃ

> 'They (অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা) were predominantly Hindu, not only in composition but also in ideology. A fervent nationalism now emerged, ... tinged with mysticism and revelling in religious enthusiasm.'[১৪৪]

> 'None the less the intensity of Hinduism involved distinguished it effectively along communal lines.'[১৪৫]

> 'নবগোপালবাবু (নবগোপাল মিত্র) দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্র নাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন।'[১৪৬]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে হিন্দু-মেলার মূল উদ্দেশ্য বোঝা যায়। হরিশচন্দ্রের সরলা শ্রেণীর চরিত্রগুলি জাতীয়বাদী-হিন্দুর বিশিষ্ট প্রতিনিধি।

স্বাদেশিকতা প্রচারে আচার্য অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কালাপাহাড় জগন্নাথ মন্দির ভস্মীভূত করতে অগ্রসর হলে তিনি জাতীয়তাবাদের নামে সমস্ত হিন্দুদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত করেন। তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে উনিশ শতকের উগ্র হিন্দুত্ব প্রচারকের কোন পার্থক্য নেই ঃ

> 'আচার্য। তবে সকলে একতার হার গলায় পর। আর বিলম্ব কর না। (শৃঙ্গবাদন) যবনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কর। তোমাদের প্রাণের হিন্দুধর্ম নষ্ট হল। সেই প্রেমের প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি ভেঙ্গে গেল; সব দেবদেবী নষ্ট

হল ; পুড়ে ছারখার হল ; হায়! হায়! এখনও হৃদয়ে যে সুখ পাচ্ছিনে? ভারত ভূমি অস্ত্রধারণ কর। স্বজাতির বলের পরিচয় দাও। যবনের হৃদ-পিণ্ডের অন্তদেশ বিদ্ধ কর।'

আচার্য।... দেশ গেল ; ধর্মলোপ হল ; ম্লেচ্ছ ধর্ম দেশকে ডুবিয়ে দিল।... ভারতের সতী নারীর রক্তে মাটী কর্দমাক্ত কচ্ছে! মাত! ভারতভূমি! চেয়ে দেখ, হিন্দুর জাতিত্ব, জ্ঞাতিত্ব, প্রভুত্ব, সকলি গিয়াছে, যবন ভারতের রাজা হয়েছে।''' তোমাদের সোণার-ভারত আজ ছারখার হল। তোমাদের ভারতের হিন্দুর গৌরব-সূর্য আজ অস্তমিত হল। ভারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল। সোণার ভারতের বঙ্গ-সন্তান চেয়ে দেখ।'[১৪৮]

রাজনৈতিক কারণে পাক-ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধের সূচনা হয়, নাটকটি মূলত সেই বিরোধ-পর্বের ইতিহাস। অবশ্য হরিশচন্দ্রের তুলনায় মনোমোহন গোস্বামীর নাটকে এই বিরোধ আরও সম্প্রসারিত। সোলেমান-কালাপাহাড় মুসলমান সমাজের প্রতিভূ, আচার্য, সরলা, মুকুন্দদেব হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধি। তাঁদের বিরোধ উনিশ শতকের রাজনৈতিক বিরোধের ইতিহাসের ছায়া মাত্র। সেজন্যে সরলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যেমন হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি সোলেমান প্রভৃতির মাধ্যমে একশ্রেণীর উগ্র মুসলমানদের ধর্ম-চেতনাও নাটকে সমানভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

'সোলেমান।''' ভারতের নানা স্থানে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করে সকলের হৃদয়ে যবনধর্মের বিশুদ্ধ শোণিত প্রবাহিত কর। স্থানে স্থানে যথায় কাফেরদের দেবমন্দির আছে সমস্ত ভঙ্গ কিংবা ভস্মসাৎ করে তথায় উত্তম উত্তম মসজিদ ও পীরের পবিত্র স্থান নির্মিত কর।

কালাপাহাড়। জাঁহাপনা, আপনি বেশ জানবেন যে, কালাপাহাড় আপনার কার্যে নিমেষ মাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ করে না, কর্বেও না।''' তবে অনুমতি দিন, এখন প্রস্থান করি। ভারতের নানা স্থানে মুসলমান ধর্মের ধ্বজা উড্ডীন করিগে। বিধর্মী কাফেরদের শোণিতে ভারতভূমি কর্দমাক্ত করিগে, দেবদেবীর মন্দির ও দেবতার প্রতিমূর্তি সমস্ত ভগ্নাবশেষ করিগে, দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, সকলকেই মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিগে, এই আমার একমাত্র ব্রত।'[১৪৯]

নাট্যকার উপরোক্ত চরিত্রের মাধ্যমে — মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ করতে গিয়ে অতীত ইতিহাস চেতনা ও বর্তমান রাজনৈতিক চেতনা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারেন নি।

কালাপাহাড় শ্রেণীর নাটক-উপন্যাসের মূল্য রাজনৈতিক কারণে যতটা, সাহিত্যিক কারণে ততটা নয়। এর একমাত্র কারণ: এই শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে প্রত্যক্ষভাবে সমকালীন রাজনৈতিক চেতনা ক্রিয়াশীলছিল। মনোমোহন গোস্বামীর 'ধর্মবিপ্লব' নাটক এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। সমকালীন নাটকে প্রচারধর্মিতা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করায় নাট্যকারেরা সাহিত্যিক গুণগত উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করতেন না — ফলে নাটক প্রচার-বাহনের ঊর্ধ্বে উঠ্‌তে কোন সময়েই সক্ষম হত না। মনোমোহন গোস্বামীর নাটক সমকালীন অন্যান্য নাটকের তুলনায় অধিকতর জাতীয়-চেতনাপুষ্ট হলেও সাহিত্যিক গুণ সম্পন্ন নাটক। নাটকটি সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তার প্রমাণ এর তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ ও স্টার রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্মীয় চেতনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে বলে তা বিস্তারিত আলোচনার যোগ্য। কালাপাহাড়, নিরঞ্জন ও বামাচরণ হিন্দু জাতীয়তাবাদপ্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য শাখা চরিত্র প্রধান চরিত্রগুলি পরিস্ফুট করতে সহায়ত করেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি অতি উগ্রভাবে জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমান-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে ফাটল ধরে। ধর্মের নামে আচারই বেশী করে প্রশ্রয় পেতে থাকে। নাট্যকার সে-যুগের তিক্ততা ও বিরোধের খণ্ড খণ্ড দৃশ্য নাটকে ব্যবহার করেছেন যুগ প্রয়োজনে। নাটকের সূচনাতেই দেখা যায় গো-হত্যাকে কেন্দ্র করে কাজীর সঙ্গে কালাপাহাড়ের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত:

> 'কালাচাঁদ। কি বল্‌ছ নিরঞ্জন! ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে শেষে কি নাস্তিক হলে নাকি, হিন্দুর সন্তান আমি, ব্রাহ্মণ আমি — চক্ষের উপর গো-হত্যা দেখব! কাজির পায়ে ধরে কাঁদ্‌লুম, আমার সর্বস্ব দিতে চাইলুম, তবু কি সে নিবৃত্ত হল? কাজেই যেরূপে হ'ক আমাকে গো-হত্যা নিবারণ করতে হল। গাভী যে স্বয়ং মা ভগবতী![১৫০]

এবং —

> কালাচাঁদ। কিন্তু নয়ান চাঁদ রায়ের জমীদারীতে পূর্বে কখনও গো-হত্যা হয়নি, আর আমার জীবৎকালে আমি তা কখনও হতে দিব না।[১৫১]

উপরোক্ত ঘটনার ক্ষেত্রে নাট্যকার সম্পূর্ণ ভাবে যুগকালীন ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। ধর্মের নামে গো-রক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত মহারাষ্ট্রের পুণাতে। এই মতবাদ ক্রমে বাঙলাতেও বিস্তৃত হয়। গো-রক্ষা ও গো-বধ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে চরম তিক্ততার সৃষ্টি হয়। হিন্দুরা গো-রক্ষাকে যেমন ধর্মীয় বিধানের মত পালন করতে থাকে, মুসলমানরাও তেমনি ধর্মের নিয়মানুসারে গরু-কোরবানী অবশ্য প্রতিপালনীয় বলে মনে করে। পাক-ভারতের বিভিন্ন স্থানে গো-বধকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> 'বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায়, এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনো কালেই মিটিতে পারে না। নিজ ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব, অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না।[১৫২]

কালাচাঁদ ছিলেন নির্ভীক ব্রাহ্মণ — ধর্মীয় অনুশাসনের মর্যাদা ছিল তাঁর কাছে সর্বাধিক। জাত্যভিমান তাঁর কাছে প্রবল হওয়ার জন্যে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারেননি — কেননা, সংস্কারবোধের ঊর্ধ্বে ওঠা তাঁর পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। নবাবকন্যাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করায় কালাচাঁদকে কারাগারে রাখা হলে নবাব-কন্যার সহচরী মতিয়া তাঁর সংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করেন ঃ

> মতিয়া। আপনি বিদ্বান, ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ আপনি যবনকে এমত ঘৃণা করেন? সামান্য মতিহীনা নারী আমি, কিন্তু আপনার চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দেখে আমাকেও লজ্জিতা হতে হয়!'

আপনার ন্যায়, যবনের শরীর কি রক্ত-মাংসে গঠিত নয়, এই বঙ্গভূমি কি উভয়ের মাতৃভূমি নয়? যিনি আপনার স্রষ্টা, তিনিই কি যবনকে সৃষ্টি করেন নি? তবে স্থানভেদে কালভেদে জলবায়ুগুণে, মানবের রুচি এবং আহারের কিছু তারতম্য হয়। আর ধর্ম! যিনি আমাদের খোদা, তিনিই আপনাদের ভগবান! যে নামেই ডাকুন না কেন, তিনি এক! আপনি যবনের চাকরী করেন, যবনকে রাজা বলে মান্য করেন, অথচ অন্তরে এরূপ বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ কি আপনার ন্যায় মহানুভবের কর্তব্য? [১৫৩]

দুই শতকের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হলেও উভয়ের মধ্যে পূর্ণ প্রাণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হিন্দুরা স্বার্থের জন্যে মুসলমানদের দাসভুক্ত করেছিল বলে আন্তরিকতার পরিবর্তে প্রয়োজনের সম্পর্ক ছিল বেশী। উভয়ের ধর্ম ও জাতীয়তার আদর্শ বিভিন্ন হওয়ার জন্যে মিত্র সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। নাট্যকার কালাপাহাড়ের মুসলমান হওয়ার পর তার মার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার চিত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুর সমকালীন মনোভাবটি চিত্রিত করেছেন ঃ

দুর্গা। হাঁ দেব এখন তুমি তাকে বলগে, যে, এ হিন্দুর বাড়ী, ব্রাহ্মণের বাড়ী, রায়বংশের বাড়ী, মুসলমানের সম্মুখে এ দ্বার কখন উদ্ঘাটিত হবে না!

জমাদার। মা! কালু যে তোর লেড়কা!

দুর্গা। আমার পুত্র মুসলমান নয়!' [১৫৪]

নাট্যকারের উক্তি থেকে বোঝা যায়, হিন্দু-মুসলমান এক দেশমাতৃকার সন্তান নয়—তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হেতু সম-অধিকার বঞ্চিত। এককালীন বিদ্রোহী সবরকার হিন্দুত্বের এই উগ্র মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন, পাক-ভারতে হিন্দুরা যে জাতীয়তাবাদী স্বরাজের জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে তা হিন্দু-স্বরাজ। হিন্দুর হিন্দুত্ব সংরক্ষণ তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এখানে হিন্দুরা অ-হিন্দুর কোন দাবী স্বীকার করবেনা কোন মতেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধে হিন্দুদের এই মনোভাবের নিন্দা করেছিলেন ঃ

'মানুষের সঙ্গে মানুষের যে একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, সে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে

অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না — সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে, যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গী করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।' [১৫৫]

একথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয়তাবাদী গোঁড়া হিন্দুমতের পাশাপাশি উদার মতবাদ প্রচলিত ছিল। হিন্দু-মুসলমানেরমিলনাকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁদের ব্রত। উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সাহায্যে তাঁরা অখণ্ড জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। গান্ধী এই মিলনের অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলেই হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে 'ভাই ভাই' সম্বোধন করেছিল। 'ধর্ম-বিপ্লব' গ্রন্থে চাঁদ খান ও নিরঞ্জনের কথোপকথনে সমন্বয়বাদী মনোভাব প্রকাশিত।

চাঁদ। দেবালয়মাত্রেই পবিত্র, এতে হিন্দু-মুসলমান নেই পার্সি-খ্রীস্টান নেই। সকলেরই উদ্দেশ্য এক — সেই জগৎ পিতা ঈশ্বরের আরাধনা।
নির। আপনার উদারতায় আমি মুগ্ধ! যদি সকল যবন আপনার মত হত, তাহলে কি হিন্দু-যবনে কখন বিবাদ হয়? [১৫৬]

নাট্যকার সমসাময়িক সমন্বয়বাদ ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদ — এই দ্বিজাতীয়মতবাদ দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সমন্বয়ধর্মিতার গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেছিলেন কিন্তু সংস্কারবশে হিন্দু-জাতীয়তাবাদ কোন সময়েই পরিত্যাগ করতে পারেননি। কালাপাহাড়, সরমা, দুর্গা, বামাচরণ চরিত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দ্বিজাতিত্ব-দ্বন্দ্বের ফলে কালাপাহাড় নিজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেননি। কখনো তিনি হিন্দু-সংস্কার আঁকড়ে ধরেছেন, কখনো বা জড়ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে সেগুলি স্মরণীয়।

কালাচাঁদ। কি ঘৃণিত প্রস্তাব! স্মরণেও শরীর শিউরে উঠে! যবনী বিবাহ করব — ধর্ম ত্যাগ করব! তার চেয়ে এ তুচ্ছ প্রাণ যাওয়াই ভাল।

কালাচাঁদ মুসলমান হওয়ার পর স্ত্রীর সঙ্গে কথোপককথনের চিত্র ঃ

সরমা। আমি হিন্দু নারী, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত দৈহিক নয় — শুধু ইহ-জীবনের নয়! পরকালেও আমাদের সম্পর্ক অটুট থাকবে। সেখানে তোমার পার্শ্বে স্থান আমারই — যবনীর নয়। [১৫৭]

কিন্তু এ-জীবনে তোমাকে আর স্পর্শ করতে পারব না — আজন্মা জিত সংস্কার ত্যাগ করতে পারব না! আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুই থাকব![১৫৮]

নিরঞ্জন। হায় হিন্দুধর্ম! তোমার কুসংস্কার ও সংকীর্ণতাই যত অনিষ্টের মূল![১৫৯]

নিরঞ্জন হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করলেও তিনি যে ধর্ম সম্পর্কে অতি সচেতন, তার পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে মতিয়ার প্রতি তাঁর বক্তব্যে। ঐহিক জীবনে ধর্মকেই তিনি প্রধান স্থান দিয়েছেন :

বন্ধু জানি না — আত্মীয় জানি না — পিতা জানি না — পুত্র জানি না — ব্রাহ্মণ জানি না — যবন জানি না, শুধু এই জানি — ধর্ম আমার সর্বস্ব — ধর্ম আমার প্রধান লক্ষ্য — ধর্মই আমার ধ্যান-জ্ঞান! যে সেই ধর্মে ব্যাঘাত দেবে, বন্ধু ত তুচ্ছ কথা, সে যদি আমার জন্মদাতা পিতাও হয়, তার তুল্য শত্রু আমার জগতে নেই! তুমি বুঝতে পারবে না, যদি তুমি হিন্দু হতে, আমার প্রাণের কথা বুঝতে, তা হ'লে বুঝতে — ইহ জগতে ধর্মের চেয়ে উচ্চতর লক্ষ্য হিন্দুর আর নেই। তাহলে বুঝতে সংসারের সকল প্রিয় বস্তু, ধর্মের জন্য হিন্দু অকাতরে স্বার্থত্যাগ করতে পারে।[১৬০]

কালাপাহাড় চরিত্রে দ্বন্দ্ব ছিল — কালাচাঁদ আর কালাপাহাড়ের মধ্যে কোনদিন সমন্বয় হয়নি। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি যেমন সমন্বয় ও উগ্রমতের মধ্যে কোন প্রকার ঐক্য আনতে পারেননি, তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রেও সংশয়-দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়েছেন। যে নির্ভীকতা কালাপাহাড় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই কালাপাহাড় কারাগারে বন্দী হওয়ার পর মতিয়ার কাছে ভীরুতা প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনি অনেকখানি কৃত্রিম :

কালাচাঁদ। ভণিতা রাখ, তোমার আগমনের কারণ কি? কিন্তু আমি পূর্ব হতে বলে রাখছি, তোমাদের কোন চাতুরী আমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না।[১৬১]

মতিয়া। কিন্তু অপরের জন্য যে জীবন রাখতে হবে!

কালা। তোমার মনিবের জন্য? তাঁকে বলো তাঁর সে চেষ্টা বৃথা! যথেষ্ট দরদ দেখান হয়েছে! এখন তুমি বিদায় নাও।[১৬২]

দুলারীর প্রেমে মুগ্ধ কালাপাহাড় তাঁকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারেননি। আজন্মার্জিত হিন্দু সংস্কার — তাঁর পক্ষে বাধাস্বরূপও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাদেশ আনতে যাওয়ার সময় তার মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

> কালা। আমার জীবন সরমাময়! সরমা আমার ধ্যান — সরমা আমার জ্ঞান — সরমা আমার সর্বস্ব — সরমা আমার জীবনের ধ্রুবতারা।[১৬৩]

কালাপাহাড়ের স্বধর্মত্যাগের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল ক্রোধ ও জিঘাংসা—প্রতিশোধের ইচ্ছাতেই তিনি পরধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে সেইধর্ম ও দুলারী তাঁর প্রাণে শান্তিবর্ষণ করতে পারেনি। তাঁর ধর্ম সম্পর্কে চাঁদখান সোলেমানকে বলেছেন :

> 'আমার বিশ্বাস, সে হিন্দুও নেই, মুসলমানও হয়নি, সে নাস্তিক হয়েছে!'[১৬৪]

দুলারী চরিত্র পূর্ণ বিকশিত। প্রেমবোধই তাঁর জীবনের মহোচ্চলোক। প্রেমসাধনার আদর্শ জীবনে প্রধান হয়ে ওঠায় তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত এবং সেজন্যে প্রাণবন্ত। কালাপাহাড়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ গুণ-মুগ্ধতার ভাব থেকে জাগ্রত। সমকালীন কোন নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটি বিকৃত করেননি — সকলেই তাঁর প্রেম-গভীরতার চিত্রটি সুন্দরভাবে এঁকেছেন। মনোমোহন গোস্বামীও তার ব্যতিক্রম নন — সমকালীন কালাপাহাড়-কেন্দ্রিক গ্রন্থ দ্বারা তিনি প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। দুলারী নিজের প্রেম-স্বরূপ সম্পর্কে সখী মতিয়ার কাছে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন :

> 'আমি প্রতিদান পাবার আশায় ভালবাসিনি। আমার এ ভালবাসা লালসাপূর্ণ নয়! ওঁকে পাই বা না পাই, উনিই আমার পতি, উনিই আমার ঈশ্বর! ওঁর রূপ ধ্যান করব, ওঁর গুণ গান করব, ওঁর চরণে মনে মনে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি দেব! তাতেই তৃপ্তি পাব, তাতেই সুখী হব, তাতেই প্রাণ ভরে যাবে!'[১৬৫]

সরমার 'জন্মে জন্মে তুমি আমার পতি' — বোধের সঙ্গে দুলারীর প্রেমবোধের পার্থক্য আছে। সরমার প্রেম সংস্করবোধজাত, দুলারীর প্রেম স্বাভাবিক হৃদয়জাত।

মনোমোহন গোস্বামী কালাপাহাড়-কেন্দ্রিক সমকালীন বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাদি দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। নাটকের ঘটনা সংস্থাপন, কাহিনীর ধারা, চরিত্রগুণ, জাতীয়তাবোধের বিকাশ-ধারা লক্ষ্য করলে তা সহজেই বোঝা যায়। ছাদ থেকে তুলারীর কালাপাহাড়-দর্শন এবং অনুরাগ, সখীর সঙ্গে প্রেম-বিষয়ে কথোপকথন; কালাপাহাড়ের নবাবকন্যার বিবাহ-ব্যাপারে আলোচনার জন্যে নবাব অন্তঃপুরে আহ্বান, তাঁর অস্বীকৃতি, নবাবের ক্রোধ ও মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার আদেশ, জাতিচ্যুত কালাপাহাড়ের পক্ষাবলম্বনের জন্যে সমাজপতি-কর্তৃক নিরঞ্জনের জাতিচ্যুতি ইত্যাদি চিত্র দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ও রসিকচন্দ্র বসুর গ্রন্থের প্রভাবজাত। সরমা কর্তৃক কালাপাহাড়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে দেখা হওয়ার বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের ভ্রমর চরিত্রের অনুরূপ। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাণী ব্রজসুন্দরীর অনুকৃতি লক্ষ্য করা যায় সরমার অন্তর্ধান ও পরে ছদ্মবেশ ধারণ এবং শাহজাদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-চিত্রে। তুলারী কর্তৃক কালাপাহাড়ের পৃষ্ঠরক্ষাও উপরোক্ত গ্রন্থের প্রভাবজাত।

গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাটক কালাপাহাড়-কেন্দ্রিক অন্যান্য নাটকের মত জাতীয়তাবাদী সুরে উচ্চকিত নয় — আলোচ্য নাটক রচনার সময় তিনি রামকৃষ্ণের ভক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে তাঁর মানসিক-আসক্তি ছিল ভক্তিবাদের প্রতি। তার ফলে তাঁর নাটকে সম্পূর্ণ একটি নতুন সুর শোনা যায়। তাঁর নাটকে ধর্মদ্বেষী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ভক্ত প্রেমিকরূপে প্রকাশিত। একদিক দিয়ে বিচার করে দেখলে নাটকের কালাপাহাড় গিরীশচন্দ্র নিজেই। রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হয় এবং তিনি তাঁর আদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন। কালাপাহাড়ের প্রথম জীবনের সঙ্গে শেষ জীবনের পার্থক্য উচ্ছৃঙ্খলতা আর ভক্তির। সেজন্যে কালাপাহাড়ের মধ্যে গিরীশচন্দ্র নিজের প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছিলেন।[১৬৬] যুদ্ধের উন্মাদনার চেয়ে বেণু-কাননে নির্জন প্রেমগীত নায়ক কালাপাহাড়ের কাছে অধিক আকর্ষণীয়।

নাট্যকার 'কালাপাহাড়কে' 'ভক্তিরসাত্মক-ঐতিহাসিক নাটক' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কাহিনী নির্মাণের ধারা বিশ্লেষণের পর নাট্যকারের মন্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। কালাপাহাড়কে 'ভক্তিরসাত্মক-ঐতিহাসিক নাটক' না বলে

শুধুমাত্র 'ভক্তিরসাত্মক নাটক' বলাই শ্রেয় এবং অনুরূপ প্রেক্ষাপটে আলোচনা করলে মূল্যায়নে কোন প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কাহিনীর প্রতি যে পরিমাণে তথ্যানুগত্যের প্রয়োজন সে-সম্পর্কে নাট্যকার সচেতন ছিলেন না। সমগ্র কালাপাহাড়-নাটক ব্যর্থ অনুকৃতির স্বাক্ষরে পূর্ণ। ঐতিহাসিক তথ্য নাটকে কি পরিমাণ থাকা প্রয়োজন এবং কল্পনার সঙ্গে ইতিহাস-কাহিনীর সম্মিলনে যে দ্রবণ জমে — গিরীশচন্দ্র এর কোনটির প্রতিই সতর্ক দৃষ্টিপাত করেননি। ফলে, নাটকে কালাপাহাড়, সোলেমান কররানী, মুকুন্দদেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র তাদের নিজস্ব পরিবেশ এবং জীবনধারা থেকে আলাদা এক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আলোচ্য চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য নাটকে অনুসন্ধান করা সবিশেষ শ্রমসাধ্য। ঐতিহাসিক রস সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য :

> "ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁহার রচনায় ঐতিহাসিক রসকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই রসের সৃজনই প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁহার নাটক সৃষ্টিতে যে-পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজন তাহার অধিক গ্রহণ করেন না। নরনারীর সুখ-দুঃখের সুপ্রত্যক্ষ কাহিনী ঐতিহাসিক নাট্যকার একটি সুবিশাল রঙ্গভূমির মধ্যে সংস্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তোলেন।"[১৬৭]

নাট্যকার তাঁর রচনায় 'ঐতিহাসিক রস্‌কেই ফুটিয়ে তোলেন—সমালোচকের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'কালাপাহাড়' বিচার করলে দেখা যায়, নাটকের মহৎ ত্রুটি তিনি 'ঐতিহাসিক রস' সৃজনে সক্ষম হন নি। ভক্তিরস সৃজনে তাঁর আসক্তি ছিল বলে তিনি আলোচ্য প্রবণতার বশবর্তী হয়ে ঐতিহাসিক উপাদান বিশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করেছেন। সেজন্যে ঐতিহাসিক তথ্য প্রয়োগে তিনি ত্রুটিযুক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নাটকে ত্রিবিধ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়, প্রথমত, ঐতিহাসিক রস অপরিস্ফুট ; দ্বিতীয়ত, প্রকৃত তথ্যের রূপান্তর সাধন ; তৃতীয়ত, নাট্য-বিধৃত চরিত্র সুবিস্তৃত পটভূমিকায় বিস্তৃত নয়। নাট্যকার মূল-কাহিনীর কয়েকটি অতি পরিচিত চরিত্র গ্রহণ করে ভক্তিমার্গের পথাশ্রয়ী হয়ে অনৈতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ভক্তির প্রবলতায় ঐতিহাসিক-

অনৈতিহাসিক সমস্ত তথ্যই একই আসনে স্থান পেয়েছে। নাটকের ত্রুটি মূলত একই ভ্রমের ফলে উৎপত্তি হয়েছে: ঐতিহাসিক তথ্যের রূপান্তর। অথচ পরিবর্তনের ফলে নাটকীয় কাহিনীর কোন মর্যাদা বৃদ্ধি হয়নি।

গিরীশচন্দ্র নাট্যকারের স্বাধীনতার প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি আরোপ করেছিলেন বলে পদে পদে ঐতিহাসিক সত্যতার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। 'কোনো সর্বজন-বিদিত এবং চিরস্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা নাট্যকারের নেই।'[১৬৮] রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিকতা, সম্পর্কে যে মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন এক্ষেত্রে তার পুনপ্রয়োগ করা যায় — 'সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রস ভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।'[১৬৯] গিরীশচন্দ্রের নাটকে ঐতিহাসিকতার বিকৃতি প্রায়-ক্ষেত্রেই পাঠক মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কালাপাহাড় সোলেমান কররানীর সেনাপতি হওয়ার পূর্বে উড়িষ্যা-রাজ মুকুন্দদেবের সেনাপতি হয়ে মুসলমান ধ্বংস করেছিলেন— এই তথ্য মূল সত্যের অনুসারী নয়। গিরীশচন্দ্র নাটকে উল্লেখ করেছেন, ইমানকে মুকুন্দদেব নিজের শিবিরে হত্যা করেছিলেন।[১৭০] ইতিহাস এই বিকৃত ও ভ্রমাত্মক কাহিনী স্বীকার করে না। প্রকৃত পক্ষে সোলেমান, ইমান, কালাপাহাড়, মুকুন্দদেব প্রত্যেকেই অস্ফুট চরিত্র।

ইতিহাসের কালাচাঁদ ইসলামধর্ম গ্রহণের পর অত্যাচারের নিদর্শনস্বরূপ 'কালাপাহাড়' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। নাটকে চিন্তামণির মুখে অন্য ভাষণ শোনা যায়:

> চিন্তামণি। তুমি মেয়ে মানুষের কথায় কান পাত না — তাই কালা, আর গট্ হয়ে বসে থাক তাই পাহাড়।'[১৭১]

নবাব-কন্যা ইমানের চরিত্রাঙ্কনে সমকালীন উপন্যাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মোহশূন্য প্রেমাবেগ, নির্মলতা তাঁর চরিত্রে সর্বত্রই লভ্য। ভক্তিবাদের পাত্রে ঢেলে এই চরিত্র নাট্যকার আরও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। যেমন,

> ইমান। আমি যবনী! নবাব সলিমান আমার পিতা। আমি পূর্বে বুঝতে পারিনি, তাই তোমায় বলেছিলেম — ব্রাহ্মণকুমারী, তাই ছল করে তোমায়

এনেছিলেম, আজ তোমার কাছে মার্জনা চেয়ে বিদায় হতে এসেছি। আমি তোমায় ভুলতে পারবো না, তুমি আমায় ভুলে যাও। তোমার উচ্চ জীবনে অনেক কাজ আছে, আমার কাজ ফুরিয়েছে।...

নবাবের ইচ্ছা তোমায় বরণ করি। তুমি দুর্দম শত্রু; তোমায় জয় করা দুঃসাধ্য। আমি তোমায় বরণ করলে তুমি মুসলমান হবে, হিন্দুকে পরিত্যাগ করবে। পাছে তোমার এই নিদারুণ কলঙ্ক হয়, পাছে তুমি মোহবশত আমায় গ্রহণ কর, এই জন্য বিদায় হতে এসেছি [১৭২]

উপরোক্ত অংশের সঙ্গে সহজে তুলনা করা চলে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাণী ব্রজসুন্দরী'র একটি অংশ :

নবাবনন্দিনী। আপনার জীবন রক্ষা করতে আসিনি, ফৌজদার সাহেব! আপনাকে আমি চিনেছি। আমার অভিপ্রায়, যে এই সর্বনাশের মূল, তার জীবন অগ্রে গৃহীত হউক।'[১৭৩]

গিরীশচন্দ্র নাটকের সর্বশ্রেণীর চরিত্রের মাধ্যমেই ভক্তিবাদ প্রচার করেছেন। চিন্তামণির নিম্নোক্ত বক্তব্যের ওপর কালাপাহাড় নাটক প্রতিষ্ঠিত।

'চিন্তামণি। কি আর হবি, যা ছিলি, তাই আছিস্, মাঝে থেকে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিস্, আর কি?

গিরীশচন্দ্রের নাটক সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর মানসিক ভাবধারার পরিচয় এবং নাটক-রচনার পশ্চাৎভূমি স্পষ্ট করে তোলা যেতে পারে :

'বাঙ্গালার নবাব সলিমানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া, কালাপাহাড় উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেবকে সিংহাসনচ্যুত[১৭৪] এবং জগন্নাথদেবের মূর্তি দগ্ধ করেন — এই ঐতিহাসিক সত্যটুকু কালাপাহাড় নাটকে থাকিলেও ইহাকে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা যায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অপূর্ব গুরুভাব প্রকাশই ইহার প্রধান উপাদান। প্রথমে গিরীশচন্দ্র নাস্তিক ছিলেন, মানুষকে গুরু বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না, অবশেষে পরমহংসদেবের কৃপায় নব জীবন লাভ করেন। এই নাটকে বর্ণিত 'চিন্তামণি' চরিত্র পরমহংসদেবের চরিত্রের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া গঠিত। গিরীশচন্দ্রের প্রথম ধর্মজীবনে যে হৃদয়-দ্বন্দ্ব সূচিত হইয়াছিল, কালাপাহাড়-চরিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়, এই চরিত্র শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের প্রভাবে অনুকল্পিত। প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা যে ঈশ্বর লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা — এই নাটকে গিরীশচন্দ্র তাহা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ চরিত্রেরই পরিণাম — প্রেম, ভক্তি, ও ভালবাসার বলে সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ।'[১৭৫]

| নির্দেশিকা |

১. বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১৪২।

২. ঐ, পৃঃ ১৪৯ — ১৫০

৩. নরহরি কবিরাজ, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, পৃঃ ১৬৪

৪. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃ ৭৯

৫. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃ ৮২

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২

৭. গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও স্বদেশী আন্দোলন, পৃঃ ৩৮১

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২

৯. রবীন্দ্রনাথ, 'শিখের বলিদান' নামে এই শ্রেণীর অপর একটি গ্রন্থেরও ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন।

১০. সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৯

১১. Richard Symonds, The Making of Pakistan, P 31, Faber-1949.

১২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ ৩২১

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৩২৫

১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতে জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ ৩৪১

১৫. প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, গণেশ সম্পর্কিত উপন্যসে আলোচনার সময় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২

১৭. এ-সম্পর্কে অন্য প্রবন্ধে বিস্তৃত আলেচনা করা হবে।

১৮. Manda, a considerable village and head-quarters of a police circle, situated on the west bank of the Atrai river, the seat of an annual fair held in honour of Rama, the seventh incarnation of Vishnu, or the occasion of the Hindu festival Shri Nabami, in March or April.' — *W. W. Hunter, Statistical Account of Bengal, vol VIII, P 56.*

মন্দা, নামটি কোথাও কোথাও 'মাঁদা' পাওয়া যায়। যেমন 'মাঁদার বিলের তীরে, আত্রাই নদী হইতে প্রায় ৬ মাইল দূর। এই স্থান রায় নবমীর খেলার

জন্য প্রসিদ্ধ। এই স্থানে সাঁদা পরগনার জমিদারদিগের কাছারি আছে।
—কালীনাথ চৌধুরী, রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহার, পৃঃ ৫৮।

১৯. এ-সম্পর্কে হাণ্টারের মন্তব্য :

'Baraigano, a village and the head-quarters of a Police Circle, situated on the north bank of the Barial river, in the east of the District.'

— *Ibid, P 56*

২০. History of Bengal, Vol II, Ed. by Sir Jadunath Sarkar, *P. 183* গোলাম হোসেন সলিম রচিত 'রিয়াজ-উ-স্-সলাতিন' নামক ইতিহাস গ্রন্থে কালাপাহাড় সম্পর্কিত নিম্নলিখিত মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকের মতে, কালাপাহাড় প্রকৃত পক্ষে ছিলেন একজন মুসলমান। তিনি বাবরের একজন ওমরাহ্। 'রাজু' নাম প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, সেকালে মুসলমানরাও 'রাজু' নাম রাখতেন। উদ্ধৃতস্বরূপ তিনি সৈয়দ রাজু নামের উল্লেখ করেন। 'মুস্তাখিবুল — তাওয়ারিখে। কালাপাহাড়কে সিকান্দর শাহের ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১ম খণ্ড, পৃ ৪২)। 'বিশ্বকোষের' (চতুর্থ খণ্ড) মতে কালাপাহাড় জৌনপুরাধিপ বহলোল লোদীর ভাগিনেয়। (পৃঃ ২০)। বিভারির সম্পাদিত 'আকবর নামায়' আছে তিনি সিকান্দারের ভাই।

২১. রাজেন্দ্রলাল আচার্য, বাঙ্গালীর বল, পৃঃ ২১১

২২. রাজেন্দ্রলাল আচার্য, বাঙ্গালীর বল, পৃঃ ২১১

২৩. History of Bangal, Vol II, D. U. *P 183*

২৪. শ্রীক্ষেত্রের 'মাদলাপঞ্জী'তে লিখিত আছে, জগন্নাথদেবকে অর্ধদগ্ধ করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার পাপে কালাপাহাড়ের হাত-পা খসে যায় এবং এইভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ-ছাড়াও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : Orissa and Her Remains: Ancient and Mediaevl, by Manomahon Ganguly, *P 28*

২৫. মার্সমান, বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত, পৃঃ ২৭-২৮।

২৬. দীনেশচন্দ্র সেন, শাশ্বত বঙ্গ (২য় ভাগ), পৃঃ ৬৬৫

২৭. বিশ্বকোষ (চতুর্থ ভাগ), পৃঃ ৫৮২ ও Riyaz us-Salatin *P8.* (*Foot note no 2*)। রিয়াজের ১৬৫ পৃষ্ঠাতে কালাপাহাড়ের মৃত্যু সম্পর্কে লিখিত রয়েছে : মুঘল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় কালাপাহাড়ের হাতী শুঁড় দিয়ে

মাসুম খাঁর ঘোড়াকে নীচে ফেলে দেয়। এই দৃশ্য দেখে মুঘল বাহিনী তীর দিয়ে মাহুতকে নিহত করার পর হাতী বিভ্রান্ত হয়ে স্বসৈন্যের দিকে ছুটতে থাকে এবং এর ফলে বহু আফগান সৈন্য নিহত হয়। পরিশেষে আফগান সৈন্যরা পরাজিত ও কালাপাহাড় নিহত হন।

২৮. বিশ্বকোষ (চতুর্থ খণ্ড)। পৃঃ ৫৮২। এখানে কন্যার নাম 'ক্ষতমালিকা।'

২৯. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড), পৃঃ ২১১

৩০. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, পৃঃ ৯৩

৩১. বহলোল লোদী ও বরবক শাহের সময় উড়িষ্যার রাজা ছিলেন পুরুষোত্তম দেব। তাঁর রাজত্বকাল ১৪৭০ — ৯৭ খ্রীস্টাব্দ।

৩২. এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত History of Bengal (Vol II), (Ed. by Sir Jadunath Sarkar) গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'From the neighbourhood of jainpur (then Capital of North Orissa), the invading Afgan army sent off a strong detachment under Kalapahar (alias Raju) to raid the temple of Jagannath..... The body of hardly picked cavalry made such a rapid dash through the country that the surprise was complete, the royal house of Orissa had then fallen into confusion and weakness, military defence was neglected, no outpost on the way was held in force or offered the least resistance.
...A large number of Brahman woman with all all their ornaments on, who had taken shelter in the temple, were seized without a fight and dragged into captivity, Sulaiman dismantled the temple of Jagannath (probably a part only) and ordered the image of Krishna, to be broken into pieces and thrown into a filthy place.' *P 183—84*

৩৩. পৃঃ ৫৭।

৩৪. দ্রঃ History of Bengal, উপরোক্ত মন্তব্য।

৩৫. পৃঃ ৫৮।

৩৬. E. A· Gait, History of Assam, P 52-53.

৩৭. Ibid, P 54.

৩৮. Ghulam Husain Salim, Riyazu-S-Salatin, P15.

৩৯. পৃঃ ২২.

৪০. বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের লেখক এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দ্রঃ দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস।

৪১. দীনেশ্চন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড), পৃঃ ৬৫৪ !

৪২. পৃঃ ৯১

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪২

'তিনি বিনাশরূপী রুদ্রের অংশে জন্মিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছিলেন।

৪৪. পৃঃ ১১৩

৪৫. পৃঃ ১২৪

৪৬. তুলনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাস।

৪৭. পৃঃ ১২৮

৪৮. ঔপন্যাসিক ফুটনোটে 'Jesuit Tieffenthaler' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

৪৯ Ghulam Husain Salim, Riyazu-S-Salatin, P 16

রামায়ণে উল্লেখিত রাবণ-ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের সঙ্গে মুকুন্দদেবের সাজাত্য দেখা যায়। তাঁর কাহিনী রিয়াজ-মতে সত্য হলে বলা যায় তিনি কলিযুগের কুম্ভকর্ণ।

৫০. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস (২য় পর্ব)। পৃঃ ৩৬৫

৫১. পৃঃ ১৩৬

৫২. পৃঃ ১৩৭

৫৩. Tarikh-i-Frishta, *Vol VII, P 298*

৫৪. J. A. S. B old Series, *Vol XLIII, P 215-20*

৫৫. স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত 'দীপ নির্বাণ'।

৫৬. মার্সম্যান, বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত, পৃঃ ২৮।

৫৭. পৃঃ ১৮৮

৫৮. পৃঃ ১৯০

৫৯. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বিশ্বকোষ (চতুর্থ খণ্ড), পৃঃ ৫৮২

৬০. পৃঃ ১০৯

৬১. P. 153

৬২. P. 182

৬৩. পৃঃ ৭৫ — ৮২

৬৪. পৃঃ ১২৮

৬৫. প্রভাত কালাপাহাড়ের ছোট ভাই। তিনি হিন্দু-ধর্ম রক্ষার্থে মুকুন্দদেবের পক্ষ হয়ে কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছিলেন।

৬৬. পৃঃ ১৬৪

৬৭. পৃঃ ১৩৩

৬৮. পৃঃ ১৪৯

৬৯. পৃঃ ১৫০ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলার জাতীয় আন্দোলন গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৭০. পৃঃ ৬

৭১. পৃঃ ৭

৭২. পৃঃ ৭—৮

৭৩. পৃঃ ৬৪—৬৫

৭৪. পৃঃ ১৫২

৭৫. কালাপাহাড়ের এই উক্তি সত্য নয়।

৭৬. পৃঃ ১৫৩—১৫৪

৭৭. পৃঃ ১৫৯—১৬০

৭৮. পৃঃ ৪৮—৪৯

৭৯. পৃঃ ৬১

৮০. 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য

৮১. বর্তমান প্রবন্ধে বসুমতী সংস্করণের গ্রন্থ ও পৃঃ ব্যবহৃত হয়েছে। ষষ্ঠ সংস্করণ। পৃঃ ১২১।

৮২. বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, পৃঃ ১৪০—৪১,

৮৩. কালাপাহাড়ের পূর্ব নাম।

৮৪ পৃঃ ১৪৩

৮৫. পৃঃ ১৬৫

৮৬. পৃঃ ১৬৫

৮৭, এ বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধের ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত ভাবে গত দুই শতকের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

৮৮. পৃঃ ১৭৩

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, পৃঃ ৩২৩

৯০. পৃঃ ১২৪

৯১. পৃঃ ১৩৪

৯২. পৃঃ ১২৮—১২৯

৯৩. পৃঃ ১৩৫

৯৪. পৃঃ ১৮৫

৯৫. পৃঃ ১২৫—১২৬

৯৬. পৃঃ ১৭৪

৯৭. পৃঃ ১৮২

৯৮. পৃঃ ১৬৯

৯৯. পৃঃ ২১৫

১০০. 'Opinion' অংশ দ্রষ্টব্য

১০১. পৃঃ ২

১০২. পৃঃ ৩—৪

১০৩. পৃঃ ৫

১০৪. পৃ ৮১

১০৫. পৃঃ ১৬—১৮

১০৬. দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৯০

১০৭. উপন্যাস পৃঃ ২৬

১০৮. ঐ পৃঃ ২৭

১০৯. ঐ পৃঃ ২৮

১১০. পৃঃ ২৯

১১১. পৃঃ ৩৭

১১২. পৃঃ ৩৮

১১৩. পৃঃ ৩৯

১১৪. পৃঃ ৪০

১১৫. দুর্গাচন্দ্র সান্যাল, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ৯০—৯১

১১৬. 'Opinion' অংশ দ্রষ্টব্য।

১১৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৩১—৩২

১১৮. পৃঃ ৯৮
১১৯. পৃঃ ১০১
১২০. পৃঃ ১০৬
১২১. পৃঃ ১০৮
১২২. পৃঃ ১২৯
১২৩. Dialogues of Plato, Ed. by J. D. Kaplan (Symposium অংশ দ্রঃ)
১২৪. পৃঃ ১৫৯
১২৫. পৃঃ ৯৭
১২৬. পৃঃ ১৩২
১২৭. পৃঃ ১২২
১২৮. দ্রষ্টব্য 'রাজা গণেশ।'
১২৯. হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের প্রথম প্রকাশের তারিখ খুঁজে পাইনি।
১৩০. পৃঃ ১
১৩১. পৃঃ ২
১৩২. পৃঃ ৩
১৩৩. পৃঃ ৬
১৩৪. পৃঃ ৭
১৩৫. নাট্যকার, কালাপাহাড়, অভিধা অসাবধানে ব্যবহার করেছেন। কালাদাস তখনো কালাপাহাড় হননি।
১৩৬. পৃঃ ১২
১৩৭. পৃঃ ১৩
১৩৮. পৃঃ ১৭
১৩৯. পৃঃ ২৪
১৪০. পৃঃ ৩০
১৪১. পৃঃ ৩১
১৪২. পৃঃ ৩২
১৪৩. পৃঃ ৩৭
১৪৪. Hirendranath Mukerjee, India's Struggle for Freedom (3rd. Edn.) pp 102—103
১৪৫. W. C. Smith, Modern Islam in India, p 20θ
১৪৬. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবন স্মৃতি, কলকাতা ১৩২৬, পৃঃ ১২৮
১৪৭. পৃঃ ৮৪

১৪৮. পৃ: ৮৫

১৪৯. পৃঃ ৬৮—৬৯

১৫০. পৃঃ ২

১৫১. পৃঃ ৩

১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর (১৩৫৫ সাল সংস্করণ), পৃঃ ৮০

১৫৩. পৃঃ ৫৩

১৫৪. পৃ: ৯৫—৯৬

১৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, 'লোকহিত' প্রবন্ধ, পৃঃ ৩০—৩১

১৫৬. পৃঃ ১৩২

১৫৭. পৃঃ ৭৪

১৫৮. পৃঃ ৯৮

১৫৯. পৃঃ ১০৬

১৬০. পৃঃ ১০৯

১৬১. পৃঃ ৫১

১৬২. পৃঃ ৫২

১৬৩. পৃঃ ৮২

১৬৪. পৃঃ ১০৪

১৬৫. পৃঃ ৩৮

১৬৬. গিরিশচন্দ্রের ধর্ম-জীবন ও নাটকে ভক্তিবাদের প্রতিফলন তুলনামূলকভাবে বিচারণা এখানে প্রয়োজন নেই বলে বর্জিত হল।

১৬৭. বিভাস রায় চৌধুরী, নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা (নতুন সংস্করণ), পৃঃ ৬০

১৬৮. অজিতকুমার ঘোষ, ডক্টর, নাটকের কথা, পৃঃ ১৭৩

১৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, পৃঃ ১৫৯

১৭০. পৃঃ ৬২ (গিরিশ-ভবন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী)

১৭১. পৃঃ ১৭

১৭২. পৃঃ ৩৮

১৭৩. পৃঃ ১২৪

১৭৪. নাটকে আছে: কালাপাহাড় নিজের শিবিরে নিরস্ত্র অবস্থায় সন্ধি প্রার্থনার সময় অকস্মাৎ মুকুন্দদেবকে হত্যা করেন। সমালোচক নাটকে এই পার্থক্যটির দিকে লক্ষ্য করেন নি।

১৭৫. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৪১৪